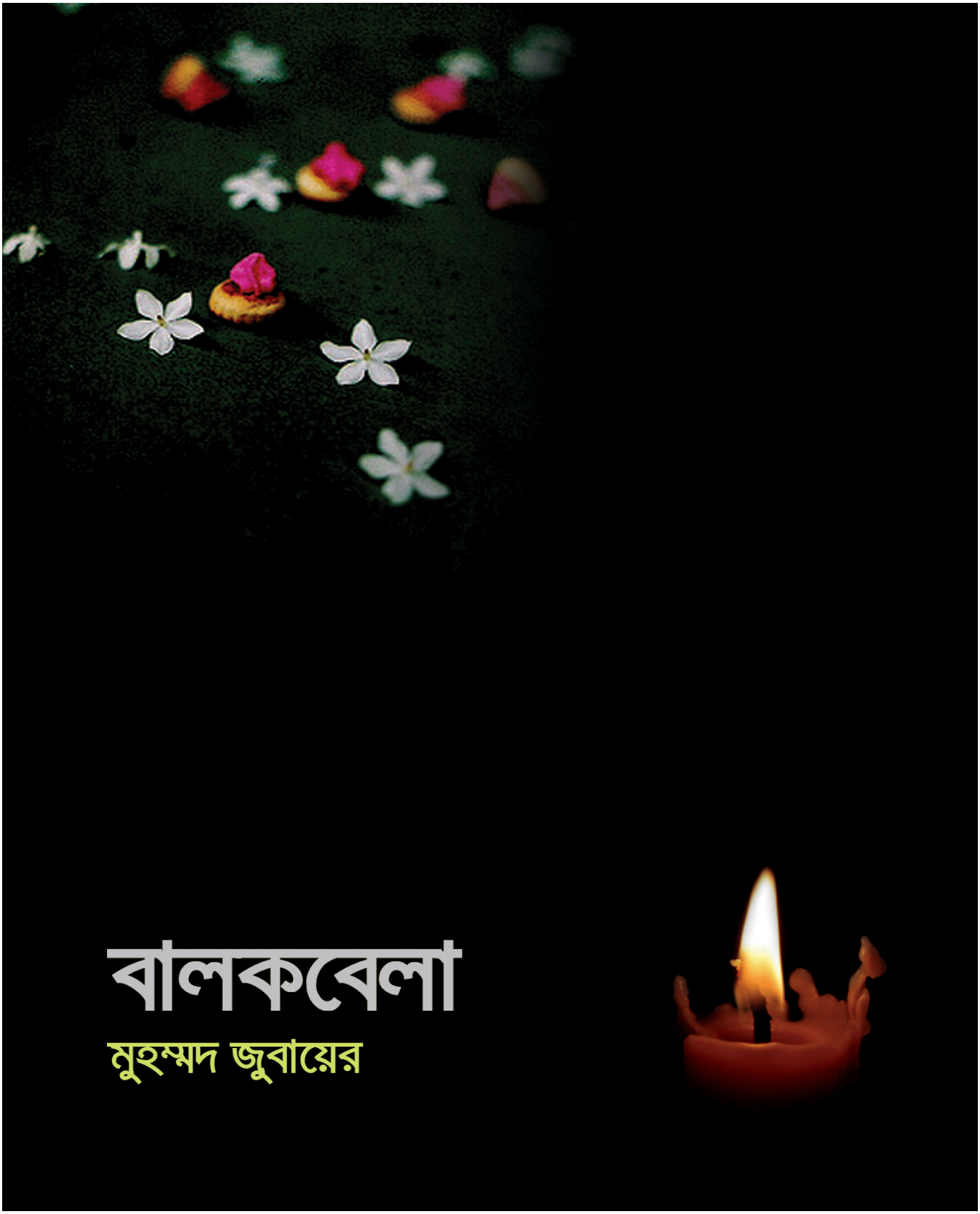

বালকবেলা

মুহম্মদ জুবায়ের

বালকবেলা

মুহম্মদ জুবায়ের

প্রচ্ছদ : নজরুল ইসলাম
(ইন্টারনেট উৎস ব্যবহৃত)

প্রকাশক :
www.sachalayatan.com
ই- বুক প্রকাশনা প্রজেক্টের পক্ষে
আরিফ জেবতিক

কপিরাইট :
মুহম্মদ জুবায়ের- এর পরিবার

লেখকের আইনগত উত্তরাধিকারীদের লিখিত অনুমতি ব্যাতীত এই ই- বুকটির কোন অংশ কোন মাধ্যমে বানিজ্যিক উদ্দেশ্যে পূন:প্রকাশ নিষিদ্ধ ।

আহা কী যে বালখিল্য...

প্রাপ্তবয়স্ক আর সব মানুষের মতো আমিও বরাবর ভেবে এসেছি, কী ক্ষতি হতো শৈশব-কৈশোরের কালটি আরো একটু দীর্ঘ হলে! সময়টি খুবই হ্রস্ব ছিলো বলে মনে হয়।

অথচ এখন লিখতে বসে আশ্চর্য হয়ে দেখছি, আমার ছেলেবেলা এতো দীর্ঘ ছিলো! বুঝিনি। গল্প ফুরায় না। অন্য কারো কাছে এইসব গল্পের কোনো মূল্য আছে কি না জানি না, আমার নিজের কাছে বাল্যকালের প্রতিটি ঘটনা, প্রতিটি মানুষ কী ভীষণ প্রিয়!

লিখছি আর ভাবছি কতো কিছু বাদ পড়ে গেলো। হয়তো স্মৃতি সবটা ধরে রাখতেও সক্ষম হয়নি। সব কি আর বলা হয়! নাকি তা সম্ভব? হয় না, অসম্পূর্ণ থেকেই যায়। তবু মন্দ কী, শুরু তো হলো।

-মুহম্মদ জুবায়ের

সাইনবোর্ড বা পুরনো দালান দেখে কোনো অনুভূতি হয় না।
জন্মস্থানের মাটি নাকি কীসব কথা বলে, অনেকে শুনতেও পায়।
নিরেট গদ্য আমি সেসব কিছুই শুনতে পাই না।
রাজশাহী শহর, পদ্মার উন্মুক্ত পাড় বা শহরের ধুলোমাটি,
মাতৃমঙ্গল হাসপাতাল আমাকে কিছু জানায় না....

মন বলে আজ রাজশাহী যাই ,রাজশাহী যাই

বিবাহিত জীবনের শুরুতে সস্ত্রীক একবার রাজশাহী যেতে হলো। ভুল হলো, বলা উচিত ছিলো ফিরে গিয়েছিলাম। রাজশাহী থেকে আমার সব যাওয়ার শুরু। এই শহর আমাকে প্রথম পৃথিবীর আলো-বাতাস সরবরাহ করেছিলো, তার কাছে আমার ঋণ আছে। আমার জন্মের আগে আমার পিতামাতার নতুন সংসারে একটি মেয়ে এসেছিলো, তাকে এই শহর ধরে রাখেনি। অল্প কয়েকদিনের আয়ু সাঙ্গ করে বিদায় নেয় সে। ফলে, আমি সেই পরিবারের জ্যেষ্ঠ সন্তানের জায়গাটি দিব্যি অধিকার করে নিতে সক্ষম হই। না-দেখা বোন সম্পর্কে আমার কোনো অনুভূতি নেই, থাকার কথা নয়। তবু জীবনভর কোনো সময় মনে না এসে পারেনি, আমার বড়ো একজন ভাই বা বোন থাকলে কেমন হতো? তার উত্তর আমার কনিষ্ঠ ভাইবোনদের হয়তো জানা আছে। আমি কী করে জানবো? এ জনমে হবে না।

এই দফায় রাজশাহী গিয়ে মাতৃমঙ্গল হাসপাতালের সাইনবোর্ড দেখিয়ে নতুন বউকে বলি, এইখানে আমার জন্ম হয়েছিলো এক গ্রীষ্মের দুপুরে।

আম্মার কাছে শোনা ছিলো। সাইনবোর্ড বা পুরনো দালান দেখে কোনো অনুভূতি হয় না। জন্মস্থানের মাটি নাকি কীসব কথা বলে, অনেকে শুনতেও পায়। নিরেট গদ্য আমি সেসব কিছুই শুনতে পাই না। রাজশাহী শহর, পদ্মার উন্মুক্ত পাড় বা শহরের ধুলোমাটি, মাতৃমঙ্গল হাসপাতাল আমাকে কিছু জানায় না। তবু আমার জন্মের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে তার জন্যে আমার আলাদা কিছু টান নেই, তা বলি কী করে?
জন্মের মতোই, কিছুটা পরোক্ষ হলেও, ঘটনাক্রমে রাজশাহী আমার বিবাহকাণ্ডে একটি ভূমিকা দখল করে বসে। মনুষ্যজীবনে জন্ম, বিবাহ এবং মৃত্যু এই তিনটি বৃহত্তম ঘটনা, মহাজনরা জানিয়েছেন। ঘটনাচক্রে আমার জীবনে তার প্রথম দুটিতে রাজশাহী এইভাবে জড়িত হয়ে যায়। সর্বশেষটিতেও রাজশাহীর চক্কর থাকবে?

আমার মুকুল ডাকনামটিও শ্যামলদার দেয়া।
আত্মীয়-পরিজন ও বাল্যকালের বন্ধুবান্ধবের কাছে শুধু এখনো টিকে আছে,
জীবনের অন্য সবখান থেকে তা বিলুপ্ত হয়ে গেছে,
হয়তো প্রয়োজনও ফুরিয়েছে বলে।

কোথায় শ্যামলদা, জানা নেই,
তার দেয়া নাম আমি আজও বহন করি...

যেন গতজন্মের কথা

রাজশাহীতে আমার শিশুকালের কোনো স্মৃতি বলতে কিছু নেই। থাকার কথাও নয়। আমরা যখন রাজশাহী থেকে বগুড়া আসি তখন আমার হাঁটি-হাঁটি-পা-পা বয়স। আমার দেড় বছরের ছোটো বোন ঝর্ণা অ্যা অ্যাঁ করছে। কিন্তু অদ্ভুতভাবে একটি স্মৃতি আমার স্মরণে হানা দেয়। আম্মাকে জিজ্ঞেস করে যাচাই করি। আম্মা অসাধারণ স্মৃতিধর মহিলা। এখন থেকে তিরিশ বছর আগে কোনো বিশেষ ঘটনার দিন বাড়িতে কী রান্না হয়েছিলো তা-ও স্পষ্ট বলে দিতে পারেন, এমনকি সেই দিনটি বুধবার ছিলো না শুক্রবার তা-ও। সুতরাং তাঁর সাক্ষ্যে সন্দেহ করার উপায় নেই।

রাজশাহীতে আমাদের বাড়ির সামনের রাস্তার ঠিক উল্টোদিকে একটি হিন্দু পরিবারের বাস। এককালে তাঁদের জমিদারি ছিলো কোথাও, তখন আর নেই। ক্ষয়িষ্ণু ও বিলীয়মান জমিদার-প্রজাতির প্রতিনিধি এই পরিবারটি। আব্বার কাছে পরে অনেকবার শুনেছি, ভূতপূর্ব জমিদার গৃহকর্তার তখন খরচ করার মতো প্রচুর টাকা ছিলো না। তবে তিনি প্রাণভরে একটি জিনিস খরচ করতেন– কলতলায় বসে প্রচুর পানি খরচ করে টানা দুই ঘণ্টা ধরে স্নান করতেন।

সেই বাড়ির এক বালক – নাম শ্যামল – আমাকে খুব আদর করতো। দিনের বেলার বেশিরভাগ সময় আমার শ্যামলদার কোলে কোলে কাটতো শুনেছি। আমার মুকুল ডাকনামটিও শ্যামলদার দেয়া। আত্মীয়-পরিজন ও বাল্যকালের বন্ধুবান্ধবের কাছে শুধু এখনো টিকে আছে, জীবনের অন্য সবখান থেকে তা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, হয়তো প্রয়োজনও ফুরিয়েছে বলে। কোথায় শ্যামলদা, জানা নেই, তার দেয়া নাম আমি আজও বহন করি।

একদিন, তখন বোধহয় আমি কলেজে পড়ি, আচমকা এই শ্যামলদরা পরনে দেখা একটি শার্টের কথা আমার মনে পড়ে যায়। সাদা জমিনের ওপর হালকা গোলাপি ও নীল রঙের খুব সরু

স্ট্রাইপের ফুলহাতা শার্ট। ব্যস এইটুকুই। আম্মাকে জিজ্ঞেস করে জানা গেলো, ওইরকম একটি শার্ট সত্যিই শ্যামলদার ছিলো। রাজশাহী ছেড়ে আসার পর তাদের সঙ্গে আর কোনোকালে দেখাসাক্ষাত হয়নি। ওই শার্ট আমার কী করে মনে পড়ে গেলো কে জানে! মস্তিষ্কের কোথায় জমানো ছিলো? বেরিয়ে এলো কোন উপায়ে? মনুষ্যমস্তিষ্ক হয়তো এইরকম আশ্চর্য সব রত্ন ও রহস্যের খনি।

ফুলমালা নামের আর কাউকে জীবনে চিনিনি, শুনিওনি।
কী সুন্দর কবিতার মতো নাম মেয়ের।
তাকে কোনোদিন দেখেছি কি না মনে নেই।

তখন এতোসব বোঝার বয়স আমার হয়নি,
কিন্তু পরে বোঝার বয়সে মনে হতো এমন সুন্দর নামের কোনো মেয়ের মা-কে
পরের বাড়িতে কাজ করে খেতে হবে – ঠিক মানায় না।

লালমাটির ছোল

বগুড়া শহর ছাড়িয়ে উত্তরে কিছুদূর গেলে চোখে পড়বে লালচে রঙের কঠিন মাটি। লাল রঙের মাটির ওপরে সবুজ ঘাস, গাছপালা – অদ্ভুত লাগে দেখতে। জন্ম রাজশাহীতে হলেও আমি বগুড়ার ছেলে। স্থানীয় ভাষায় লালমাটির ছোল।

বগুড়া শহরে আমার প্রথম স্মৃতি লাল ইটের অথবা ইটের ওপরে লাল রং করা একটি একতলা বাড়ি। আয়েশা ভিলা। এই শহরে আমাদের প্রথম বাসস্থান। ভাড়া বাড়িটির সবগুলো ঘরের কথা মনে নেই। অল্প আসবাবের বসার ঘরটি মনে আছে। শোয়ার ঘর আবছা মনে পড়ে। ভেতরের দিকে একটি লম্বাটে বারান্দা। রান্নাঘর ছিলো মূল বাড়ি থেকে আলাদা, ছোটো একটি উঠান পার হয়ে যেতে হয়। বর্ষার দিনে কাদা এড়ানোর জন্যে সারি দিয়ে পেতে রাখা ইটের ওপর পা ফেলে আম্মা রান্নাঘরে যাচ্ছেন, এখনো চোখ বুঁজলে দেখতে পাই।

আমার পিতা গোমাংস খেতেন না, কিন্তু জীবনের শেষদিন পর্যন্ত গোদুগ্ধের অনুরাগী ছিলেন এবং সে দুধ যাতে খাঁটি হয় সে বিষয়ে যত্নবান ছিলেন। অনেক পরে একসময় বাড়িতে গরুও পোষা হয়েছিলো স্বল্পকালের জন্যে। সেই আয়েশা ভিলায় বসবাসের কালে বগুড়ার মতো ছোটো শহরে, কিছু শাহরিক সুবিধাসহ একটু বড়ো আকারের গ্রামই বলা যায়, খাঁটি দুধ দুষ্প্রাপ্য ছিলো না। তাঁর ছেলেমেয়েরা প্রত্যেকেই অতি বাল্যকাল থেকে খাঁটি গোদুগ্ধে আসক্ত। মনে আছে, আয়েশা ভিলায় রাতে, এমনকি দ্বিপ্রাহরিক ঘুমের সময়ও, ঝর্ণার বা আমার ঘুম ভেঙে গেলে আম্মা ঘরের এক কোণে কাগজ জ্বালিয়ে দুধ গরম করে বোতলটি ধরিয়ে দিতেন। আমরা বিছানায় বসে চোখ বুঁজেই কোনোক্রমে চোঁ চোঁ টানে দুধ শেষ করে আবার ধপাস। সেই দুধ গরম করার কাগজপোড়া গন্ধটি আজও আমার খুব প্রিয়, হয়তো শৈশবস্মৃতির কারণেই।

আয়েশা ভিলার দক্ষিণমুখী দরজাটি খুললে সামনে একটি কাঁচা রাস্তা, ওপারে একটি টিনের চালওয়ালা মাটির বাড়ি, একপাশে খড়ের গাদা – গ্রামের বাড়িতে যেমন দেখা যায়। তার পেছনের কোনো একটি বাড়ি থেকে দুইবেলা আমাদের বাড়িতে কাজ করতে আসে ফুলমালার মা। ফুলমালা নামের আর কাউকে জীবনে চিনিনি, শুনিওনি। কী সুন্দর কবিতার মতো নাম মেয়ের। তাকে কোনোদিন দেখেছি কি না মনে নেই। তখন এতোসব বোঝার বয়স আমার হয়নি, কিন্তু পরে বোঝার বয়সে মনে হতো এমন সুন্দর নামের কোনো মেয়ের মা-কে পরের বাড়িতে কাজ করে খেতে হবে – ঠিক মানায় না। এর মধ্যে যে একটা ভয়ানক বৈপরীত্য আছে, তা হয়তো আমাদের সমাজের বাস্তবতা।

আমাদের বাড়ির সঙ্গে লাগানো পশ্চিমদিকের বাড়িটিতে এক বিশাল পরিবারের বাস। গৃহকর্তাকে আমরা নানা ডাকি। সেই সুবাদে অনেকগুলো মামা-খালাম্মা। কী আশ্চর্য, ওই বাড়িতেও একজন মুকুল এবং ঝর্ণা আছে। ঝর্ণা খালাম্মা তখন বগুড়া আযিযুল হক কলেজে পড়েন, তিনি সেখানে আব্বার ছাত্রী। কলেজে স্যার হলেও বাড়িতে তিনি আব্বাকে দুলাভাই ডাকেন। ওই বাড়ির সব ছেলেমেয়ের কাছে আম্মা হলেন আপা আর আব্বা দুলাভাই। মুকুল মামা তখন জেলা স্কুলে পড়েন। তাঁর বড়ো বাদশা মামাও সম্ভবত তাই। ঝর্ণা খালাম্মার পরের বোনগুলির নাম মান্না, নিণ্টু, বেবী ও ছবি।

বেবী আমাদের চেয়ে বয়সে সামান্য বড়ো হলেও বেবী-ছবি আমাদের দুই ভাইবোনের খেলার সঙ্গী। তিন ক্ষুদে গিন্নির সঙ্গে আমি এক প্রায়-অনিচ্ছুক বালক ক্রীড়াসঙ্গী। আমি তাদের মিছেমিছি রান্নাবান্নায় সহযোগী হই এবং রান্না চেখে বিশেষজ্ঞের মতামত দিই। আমাদের বাড়ির ছাদে ওঠার ব্যবস্থা ছিলো না। ওদের বাড়ির ছাদে উঠে বেবী-ছবি সুর করে ছড়া কাটার মতো করে বলতো – ওই বাড়ির এক মুকুল এই বাড়ির এক মুকুল, এই বাড়ির এক ঝন্না ওই বাড়ির এক ঝন্না – মিতাই মিতাই তলতি তিতাই। শেষ অংশটির অর্থ আমি আজও উদ্ধার করতে পারিনি। শুনতে মজা লাগতো। ঝর্ণাকে বাদ দিলে এই বেবী-ছবি আমার জীবনের প্রথম খেলার সঙ্গী এবং বন্ধু।

ওদের বাড়িতে দেখা আরো দু'জন মানুষকে মনে আছে। ফজলু নামে ঝর্ণা খালাম্মাদের সম্পর্কে ভাইটির সর্বদা হাসি-হাসি মুখ এখনো স্পষ্ট মনে পড়ে। এক ধরনের মানুষের চোখেমুখে সবসময় সকৌতুক হাসি লেগে থাকে, আমাদের এই ফজলু মামা সেরকম একজন। আরেকজন ছিলেন হাফিজার মামা। পেশায় দর্জি। যতোদূর মনে পড়ে, ওই বাড়ির বাইরের দিকের খোলা বারান্দায় একটি সেলাই মেশিন নিয়ে বসতেন প্রথম। পরে পার্ক রোডে এডওয়ার্ড পার্কের গায়ে

লাগানো বড়ো দোকান নিয়েছিলেন। সাইনবোর্ডে কালোর ওপরে সাদা হরফে লেখা – ড্রেসকো। তখন ড্রেসকো-তে শার্ট-প্যান্ট সেলাই করানো একটা আলাদা মর্যাদার ব্যাপার ছিলো।

পুবদিকের বাড়িতেও অনেকগুলি ছেলেমেয়ে। টুকু, মায়া, পল্টু, জিন্নাহ, আরব, ইরান। এঁরা সবাই আমাদের দুই ভাইবোনের চেয়ে বয়সে অনেক বড়ো এবং যথারীতি মামা বা খালাম্মা। গৃহকর্তা মহসীন নানা হাজী মানুষ। কিন্তু বিচিত্র কোনো কারণে শহরে সবার কাছে তিনি তিব্বত হাজী নামে পরিচিত।

পরবর্তীকালে আমাদের আয়েশা ভিলার দুই পাশের দুই বাড়ির মধ্যে খুবই মজবুত ধরনের আত্মীয়তা প্রতিষ্ঠিত হয়। ঝর্ণা খালাম্মার সঙ্গে বিয়ে হয় বাচ্চু মামার। সে এক তুলকালাম ঘটনা শহরে, সে কথায় পরে আসি। বগুড়া শহরে সিঙ্গার সেলাই মেশিনের এজেন্ট পল্টু মামার সঙ্গে অনেক পরে ছবির বিয়ে হলো, বয়সের বিস্তর ফারাক সত্ত্বেও।

জিন্নাহ মামা পরে আশরাফুল ইসলাম নামে সাংবাদিক হিসেবে খ্যাত হয়েছিলেন। বাসসের প্রতিনিধি হিসেবে নিউ ইয়র্কে স্থিত হয়েছিলেন, ৮৯-৯০ সালের দিকে ডালাসে ফোবানা সম্মেলনে দেখা হয় আমার সঙ্গে। সেবার বাচ্চু মামার সঙ্গেও দেখা হয়। অনেক অনেক বছর পর। শুনেছি তাঁর পারিবারিক এক বিপর্যয়ের পর বছর কয়েক আগে বগুড়ায় ফিরে গেছেন।

বাচ্চু মামা এবং ঝর্ণা খালাম্মাও দীর্ঘদিন নিউ ইয়র্কের বাসিন্দা। ৯৫ সালে আমেরিকা বেড়াতে এসে আব্বা-আম্মা ঝর্ণা খালাম্মাদের ওখানে দিন দুয়েকের আতিথ্য নিয়েছিলেন। পরের বছর আমি সপরিবারে নিউ ইয়র্কে গেলে বাচ্চু মামা খবর পেয়ে আমাদের নিয়ে যান তাঁদের বাসায়। ঝর্ণা খালাম্মার সঙ্গে আমার দেখা হলো কম করেও পঁচিশ বছরের ব্যবধানে। অথচ দেখা হতে মনে হলো যেন ব্যবধানটা অতো দীর্ঘ মোটেই ছিলো না!

আমাদের আয়েশা ভিলার পশ্চিমে তিন-চারটি বাড়ি পরেই বড়ো রাস্তা। শেরপুর রোড। শহরের প্রধান রাস্তা। উত্তর-দক্ষিণ বিস্তৃত এই রাস্তা উত্তরে মহাস্থানগড়, গোবিন্দগঞ্জ (আমাদের বাল্যকালে এই নামই ছিলো, পরবর্তীকালে গোলাপবাগ নামে মুসলমানিত্ব পায়) হয়ে রংপুর-দিনাজপুর চলে গেছে। দক্ষিণে ঢাকামুখী নগরবাড়ি ঘাটে লেগেছে শেরপুর-চান্দাইকোনা-উল্লাপাড়া-শাহজাদপুর-বাঘাবাড়ির ওপর দিয়ে। নগরবাড়ি থেকে যমুনা পেরোলে ঢাকার পথ।

আয়েশা ভিলা থেকে বেরিয়ে শেরপুর রোড পেরিয়ে ছোটো কাঁচা রাস্তাটি ধরে কয়েক পা গেলে হাতের বাঁ দিকের এক বাড়িতে একটি বালিকা শিশু আমার অজান্তে তখন বড়ো হয়ে উঠছিলো,

যাকে চিনবো কয়েক বছর পর এবং আরো পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে সে খানিকটা আকস্মিকভাবেই আমার হৃদয়-যাতনার কারণ হয়ে উঠবে। অনেকটা যেন তোমারে বধিবে যে গোকুলে বাড়িছে সে। অতি অল্পকাল ছিলো সে আমার জীবনে, অথবা আমি তার জীবনে। জন লেননের সেই গানের মতো – আই ওয়ান্স হ্যাড আ গার্ল, অর শুড আই সে শি ওয়ান্স হ্যাড মি । তা অন্য প্রসঙ্গ, ছেলেবেলার গল্পের সঙ্গে যায় না। তবে ওই গোকুলে বাড়ার কথা ভাবলে এখন বেশ মজাই লাগে।

বগুড়া শহরে আমাদের আসা ৫৭ সালের শেষের দিকে। আয়েশা ভিলায় আমাদের বাস খুব দীর্ঘ হয়নি। আমার সংসারবুদ্ধিসম্পন্ন পিতা বাড়ি কিনে ফেলেন, সেখানে উঠে যাই আমরা ৫৯-র আগস্ট মাসে। এই জায়গায় এসে একটা খুব অদ্ভুত কথা মনে এলো। আগস্ট মাসে আমার পিতামাতার বিবাহবার্ষিকী, সেই মাসেই তাঁরা নিজস্ব বাড়িতে উঠলেন। সাংসারিক বুদ্ধি-বিবেচনায় পিতার ধারে-কাছে না হওয়ার ফলে অনেক বিলম্বে, চল্লিশ বছর পর তাঁদের জ্যেষ্ঠ পুত্রের নিজস্ব বাড়িতে গৃহপ্রবেশ ঘটে এপ্রিলে, তাদের বিবাহবার্ষিকীর মাসে। কাকতালীয়? নাকি পারম্পর্য রক্ষা?

আম্মার জবানিতে জানা যাচ্ছে, আয়েশা ভিলা ত্যাগ করার সময় আমার পরের ভাই ফিরোজ তেরো দিনের শিশু। এর বছরখানেক আগে আমার পিতামাতা একটি একটি বড়ো শোকের সময় অতিক্রান্ত করেছেন। ফিরোজের আগে আমাদের আরেকটি ভাই জন্মেছিলো – ফারুক। আট মাস বয়সে সে মারা গেলো সামান্য কয়েক দিনের জ্বরে, তখন আমরা নানাবাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলাম। ফারুকের কথা আবছা মনে আছে, খুব ফুটফুটে দেখতে ছিলো সে। আম্মার ভাষ্যমতে আমাদের ভাইবোনদের মধ্যে সবচেয়ে সুদর্শন। তার মৃত্যুর সময় আব্বা ছিলেন না। খবর পেয়ে এলেন, অথবা এসে জানলেন। আব্বা-আম্মার সেই শোকগ্রস্ত চেহারা মনে পড়ে প্রায় স্পষ্ট। নানাবাড়ির গ্রামের শেষ মাথায় ঈদগা মাঠের পাশে ফারুকের কবরটি বাঁধিয়ে দেওয়া হয়েছিলো।

এই আয়েশা ভিলায় আমরা আবার ফিরে আসবো প্রায় পঁয়ত্রিশ বছর পর। তখন বাড়িটির আগের চেহারা আর নেই, ভেঙে নতুন করে তিনতলা বানানো হয়েছে। নামও আর আয়েশা ভিলা নেই, এখন হয়েছে ডক্টরস ক্লিনিক। হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে আব্বাকে কয়েকদিনের জন্যে সেখানকার বাসিন্দা হতে হয়। তাঁর পুরনো ছাত্ররা প্রতিষ্ঠানটি গড়েছেন। পরে তাঁকে ঢাকায় চিকিৎসা করানো হয় এবং সে যাত্রা তিনি সুস্থ হয়ে ফিরেছিলেন।

...কিন্তু প্রবল পাণ্ডিত্যের সঙ্গে ভবিষ্যৎদ্রষ্টা হওয়ার সম্ভাবনা যে শূন্য,
তা পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়ে গেছে।

তাঁকে সর্বাংশে ভুল প্রমাণ করতে আমাকে কোনো চেষ্টাই করতে হয়নি,
বিনা ক্লেশে সবার পেছনে থেকে গেছি বরাবর।
এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়ার মানুষের অভাব হবে না।

তেঁতুলতলার নতুন বাসিন্দা

আব্বা বাড়ি কিনলেন শহরের কেন্দ্রস্থল থেকে দক্ষিণে, ঠনঠনিয়ার তেঁতুলতলা এলাকায়। বাড়ির বিক্রেতা এক বৃদ্ধ দম্পতি। তাঁদের শর্ত ছিলো, বিক্রির পরেও বাড়ির একটি ঘরে তাঁরা বাস করবেন আমৃত্যু। তাঁদের হাটবাজার, রান্নাবান্না সবই নিজেদের, শুধু বসবাস করতে হবে পাশাপাশি - এক বাড়ির মধ্যে। এই শেষ বয়সে তাঁদের আর কোথাও যাওয়ার নেই। আজকের দিনের হিসেবে খুবই অসম্ভব শর্ত মনে হয়, তখন কিন্তু খুব অবাস্তব ছিলো না। তখন ছিলো অন্য এক কাল, ভিন্ন তার মূল্যবোধ ও বাস্তবতা।

তবে এই কেনাবেচায় তার চেয়েও এক বড়ো বিস্ময় ছিলো। বাড়ির বিক্রেতা দম্পতি এবং ক্রেতা দম্পতির নামগুলি বানানের সামান্য হেরফের ছাড়া হুবহু এক। জীবনে এমন কাকতালীয় ঘটনা দ্বিতীয়টি দেখিনি।

আম্মা এই বৃদ্ধ-বৃদ্ধাকে দাদা-দাদী সম্বোধন করেন, ফলে আমরা ডাকি বুড়া-আব্বা ও বুড়া-আম্মা। উচ্চারণে হয়ে যায় বুড়াব্বা ও বুড়াম্মা। আব্বা অবশ্য কোনো সম্বোধনে নেই। কী কারণে জানি না, তিনি কাউকেই এই ধরনের আত্মীয়তাসূচক সম্বোধন করতেন না। এমনকি তাঁর পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ কাউকেও না। আমাদের কাছে তাঁর পিতার সম্পর্কে কিছু বলতে হলে বলতেন, তোমার দাদা। চার ভাই ও তিন বোনের মধ্যে তিনি সর্বকনিষ্ঠ। ভাইদের প্রসঙ্গ এলে বলতেন, তোমার বড়ো-আব্বা, অথবা ভ্রাতুষ্পুত্রদের নাম টেনে বলতেন খোকার বাপ বা আশরাফের বাপ। তাঁর ভাবীদেরও কখনো ভাবী বলে ডাকতে শুনিনি। এমন নয় যে বয়োজ্যেষ্ঠদের সম্পর্কে তাঁর ভক্তিশ্রদ্ধা কিছু কম ছিলো। তাঁদের কখনো অসম্মান করেছেন বলেও জানি না। বরং ভাইদের সক্রিয় ও প্রত্যক্ষ সমর্থন-সহায়তায় পরিবারের একমাত্র তিনিই উচ্চশিক্ষা সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছিলেন, এই কৃতজ্ঞতাবোধ তাঁর আজীবন অটুট দেখেছি। তবু তাঁর এই সম্বোধন-বিমুখতার কোনো ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। জীবনে উত্তর না-পাওয়া অনেক প্রশ্নের একটি।

বুড়াব্বা-বুড়াম্মা দু'জনেই ফরিদপুর অঞ্চলের মানুষ। কী করে বগুড়া এসে ঠাঁই করে নিয়েছিলেন সঠিক জানি না। সম্ভবত বুড়াব্বার কর্মসংক্রান্ত কোনো কারণ ছিলো। তাঁর সম্পর্কে খুব বেশি স্মৃতি নেই, আমরা ওই বাড়িতে ওঠার সময় তিনি অবসরভোগী, বছর দুই-তিনেকের মধ্যে মারা যান। দুয়েকবার তাঁর হাত ধরে শেরপুর রোডে পি টি স্কুলের মোড়ে কিয়ার দোকানে গিয়েছি বলে আবছা মনে পড়ে। আমাকে সন্দেশ কিনে দিয়ে নিজে বসতেন এক কাপ চা নিয়ে। চায়ের কাপ থেকে উঠে আসা ধোঁয়া, গরম চা তিনি পিরিচে ঢেলে ফুঁ দিয়ে খাচ্ছেন – এই দৃশ্যগুলি মনে পড়ে। যতোদূর মনে পড়ে, ফিরোজ তাঁর সবচেয়ে বেশি ন্যাওটা ছিলো। আমাদের সবার ছোটো ভাই মাসুদের জন্ম তেঁতুলতলার বাড়িতে উঠে আসার পরের বছর। সে বুড়াব্বার ঘনিষ্ঠ হওয়ার সময় পায়নি, তবে বুড়াম্মার ভক্ত-অনুরক্ত হয়ে উঠেছিলো সে।

বুড়াব্বা মারা যাওয়ার পর বুড়াম্মার সঙ্গী তাঁর এক নাতনি। আমাদের লিলি খালাম্মা। আম্মা তাঁর বুবু, আব্বা দুলাভাই। লিলি খালাম্মার বয়স তখন পনেরো-ষোলো, সারাক্ষণ দেখতাম বুকের নিচে বালিশ গুঁজে উপুড় হয়ে গল্পের বই পড়ছেন। বস্তুত তাঁকে আর কিছু কখনো করতে দেখেছি এরকম মনে করতে পারি না। বকাঝকাও খেতেন বুড়াম্মার কাছে, সেসব তিনি কিছুমাত্র গায়ে মাখতেন বলে মনে হতো না।

আমাদের চার ভাইবোনের জন্যে বুড়াম্মার আদর-প্রশ্রয়ের সীমা-পরিসীমা ছিলো না। ক্ষীণকায়া বৃদ্ধার শরীর বেশ শক্তপোক্ত ছিলো। সারাক্ষণ চরকির মতো ঘুরছেন। দুপুর হলেই তিনি বাইরে কোথাও যাওয়ার জন্যে চঞ্চল হয়ে উঠতেন। কালো একটি বোরখা চাপিয়ে পায়ে হেঁটে পাড়ায় পাড়ায় পরিচিতজনদের বাড়ি বাড়ি ঘুরতে যেতেন। পানদোক্তা খেয়ে সুখ-দুঃখর গল্প করে ফিরতেন সন্ধ্যার মুখে। ঝুলিতে থাকতো রাজ্যের সব গল্প। আম্মা ঠাট্টা করে বলতেন, পাড়াবেড়ানি বুড়ি। ফোকলা মুখে বুড়াম্মা প্রশ্রয়ের হাসি হাসতেন।

এক গ্রীষ্মের দুপুরে ঝর্ণা ও আমি পড়ার টেবিলে বসে স্কুলে নতুন অর্জিত জ্ঞান নিয়ে যাবতীয় সবজির নামের তালিকা করছি। উত্তরবঙ্গে কচুর লতিকে বলে কচুর বই, বা বইকচু। এই জিনিস সবজির অন্তর্ভুক্ত কি না, আমরা স্থির করে উঠতে পারি না। বুড়াম্মা তখন আশেপাশে ছিলেন। ঝর্ণা জিজ্ঞেস করে, বুড়াম্মা কচুর বই কি তরকারি?

ঠিক শুনতে না পেয়ে বুড়াম্মা বললেন, কী জিনিস?

কচুর বই।

ফরিদপুরের টান বজায় রেখে বুড়াম্মার উত্তর, খাস কী তয়?

কতো কাল পার হয়ে গেলো তারপর। আজও আমাদের বাড়িতে কচুর বই বললে খাস কী তয় অবধারিতভাবে আসে, উচ্চারিত হয়। স্মৃতির ধুলো সরিয়ে বুড়াম্মা উঁকি দেন এক ঝলক। কতো তুচ্ছ একটি কথা কীভাবে আমাদের সঙ্গে চলমান থেকে যায়, মানুষটি না হয় না-ই থাকলো!

লিলি খালাম্মার বাপের বাড়ি আধ মাইল দূরে গাড়ামারায়, পরে এই জায়গার নাম হয় রহমাননগর, আনসার ক্যাম্পের মাঠটির পুবদিক ঘেঁষে। সেখানে তিনি যেতেন কদাচিৎ। কিছুদিন পর তাঁর বিয়ে হয় ফরিদপুর অঞ্চলের কোথাও। একবার জ্বর গায়ে নিয়ে বুড়াম্মা গেলেন নাতনির শ্বশুরবাড়ি। আর ফিরলেন না। গভীর রাতে ঘুম থেকে ডেকে তুলে বুড়াম্মার মৃত্যুর সংবাদ দেওয়া হলো। আমার প্রতিক্রিয়াটি স্পষ্ট মনে আছে এখনো। সদ্যভাঙা ঘুমের কারণে হোক বা বুড়াম্মা এইভাবে আচমকা চলে গেলেন এই ক্ষোভ-অভিমানে ঠিক বলতে পারবো না, আমার মুখ থেকে বেরিয়ে এলো, গেলো কেন অসুস্থ শরীর নিয়ে? কে যেতে বলেছিলো? কী দরকার ছিলো?

মৃত্যু কী জিনিস তখনো ভালো করে জানি না, মৃত মানুষের কাছে এই যে এই অনুযোগ পৌঁছানো সম্ভব নয় তা-ও বোধহয় ঠিক জানা ছিলো না। ঠিক মনে নেই কে, তবে এই মর্মে কারো মৃদু তিরস্কার শুনেছিলাম যে, মৃত মানুষের সম্পর্কে এভাবে বলতে হয় না।

এক অভিজ্ঞান অর্জিত হলো। তখন আমি ক্লাস নাইনে।

তেঁতুলতলায় আমাদের নতুন বাড়ির দেওয়াল মাটির তৈরি, তার ওপরে সিমেন্টের আস্তরণ দিয়ে চুনকাম করা। ইটের বাড়ি বলে ভ্রম হয়। টিনের চাল। বৃষ্টি এলে টিনের চালে শব্দ ওঠে, ঘরের ভেতরে শুয়েবসেও সেই শব্দ শুনে বুঝি বৃষ্টির তীব্রতা কতোটা। খোলা জানালা দিয়ে হাত বাড়ালে বৃষ্টির ছাঁট এসে পড়ে। এখনো ইচ্ছে করলে বৃষ্টির স্পর্শ পাওয়া সম্ভব, কিন্তু টিনের চালে বৃষ্টির সেই শব্দ জীবন থেকে কবেই হারিয়ে গেছে।

তখন সবে স্কুলে ভর্তি হয়েছি অথবা হবো-হবো। আমাদের রান্নাঘরের পুবদিক ঘেঁষে একটা বড়ো পেয়ারা গাছ। গাছে উঠতে পারি না। আমি আর ঝর্ণা মই বেয়ে টিনের চালে উঠে পেয়ারা পেড়ে খাই, পকেটভর্তি করে নিয়ে নেমে আসি। এইরকম একদিন চালে উঠেছি, আচমকা ভীষণ তোড়ে বৃষ্টি নামলো। আকাশ মেঘলা ছিল, কিন্তু এতো তাড়াতাড়ি বৃষ্টি শুরু হবে ভাবা যায়নি।

টিনের চালে সেই বৃষ্টির শব্দের ভীষণ শব্দে আমি ভয় পেয়ে যাই, কেঁদে ফেলি। ঝর্ণা কিন্তু দিব্যি মই বেয়ে নেমে গেলো। আমি দিশেহারার মতো কাঁদতে লাগলাম, নেমে যাওয়া যে দরকার এবং সম্ভব, তা-ও মনে আসে না। সেদিন শেষ পর্যন্ত কী হয়েছিলো, নিজে নেমেছিলাম না কেউ নামিয়ে এনেছিলো মনে নেই। সেই রাতে আমার প্রবল জ্বর আসে, তীব্র জ্বরের ঘোরে রাতভর আমি প্রলাপ বকি। প্রলাপে আমি হাতি ধরার বাসনা প্রকাশ করেছিলাম বলে জানা যায়।

আমার এই বীরত্বের কাহিনী আজও আমাদের পরিবারে কিংবদন্তিসম হয়ে আছে। আম্মার কাছে শুনে শুনে এমনকি ফিরোজ-মাসুদ, যাদের তখনো তেমন বোঝায় বয়সই হয়নি, হলেও মনে থাকার কথা নয়, তারাও এই ঘটনার সরস বিবরণ দিয়ে থাকে, যেন তারা ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী।

বাড়ির ভেতরে আরো কিছু গাছপালা ছিলো। উঠানের ঠিক মাঝখানে একটি আম গাছ, সে গাছের আম খুবই মিষ্টি, কিন্তু কোনো এক দুর্জ্ঞেয় কারণে পাকতে শুরু করলেই আমে পোকা ধরে যেতো। রান্নাঘরের পশ্চিমদিকে আরো একটি পেয়ারা গাছ লাগানো হয়েছিলো, এই গাছের পেয়ারা সংখ্যায় কম হলেও আকারে বিশাল এবং অতি সুস্বাদু। রান্নাঘরের সামনের দিকে একটি ডালিম গাছ। পুবের দেওয়াল ঘেঁষে পাশাপাশি দুটি কাঁঠাল গাছ। অতি মিষ্ট সেই গাছের কাঁঠাল।

পুবের দেওয়ালের ওপাশের বাড়ির মালিক কমরুদ্দিন সাহেব, শুনেছি তিনি পেশায় ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার, এ বাড়িতে বাস করতেন না। ভাড়া দিয়েছিলেন মেসবাড়ি হিসেবে, সেখানকার কোনো বাসিন্দার কথা আমার স্মরণে নেই। মেসবাড়ির পাশ দিয়ে আমাদের বাড়ির খিড়কি দরজা। এই টিনের দরজা দিয়ে বেরিয়ে একটা ছোটো গলিপথ, বাঁ দিকের বাড়ির মমতাজ ভাই ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে ছিলেন মনে আছে। গলি ধরে এগোলে সামনে পীচরাস্তা, ডানদিকে ঘুরে সামান্য গেলেই পি টি স্কুলের চৌরাস্তার মোড়।

একদিন বিকেল এই খিড়কি দরজার বাইরে থেকে মহিলাকণ্ঠের চিৎকার শোনা যায়, আম্মা দ্যাখছেননি, গলির মইদ্যে পরহাণ্ড এক পোহা বাইর হইছে।

টিনের দরজায় প্রবল ধাক্কাধাক্কির শব্দ শুনে আম্মা উঠান পেরিয়ে দরজা খুলে দিতেই তাঁকে একরকম ঠেলে ভেতরে ঢুকে পড়ে শীর্ণ চেহারার এক রমণী। দেখে অনুমান হয়, ভিক্ষা চাইতে দরজায় এসেছিলো সে। আম্মা কিছু বুঝে ওঠার আগেই মহিলা নিজে থেকে দ্রুতহাতে দরজা বন্ধ করে দেয়। তার ভাষা, কথা বলার ধরন অপরিচিত, এ অঞ্চলের মানুষ নয় সে। তার বিস্ফারিত চোখ, মুখ থেকে নিঃসারিত অচেনা শব্দের সমাহার আর হাত-পা সঞ্চালনের বিবরণে অতি কষ্টে বোঝা যায়, গলির ভেতরে ঢুকে একটি সাপ চোখে পড়ে তার। ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করে সে,

দেখে ফনা তুলে পথ আগলে আছে সাপ। চেঁচিয়ে উঠতে গিয়েও চিৎকারটা গিলে ফেলতে হয়, যদি সাপ তেড়ে আসে! চুপ করে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকার পর দেখে, সাপ মাথা নামিয়ে পাশের বাড়ির মাটির দেওয়ালের গর্তে ঢুকে পড়ে। তখন সে আমাদের দরজায় সজোরে ধাক্কা দিতে শুরু করে। পোহা বলতে যে সে সাপ বোঝাতে চায়, বুঝতে অনেক সময় লেগেছিলো আমাদের।

নতুন পাড়ার বাসিন্দারা নিম্নমধ্যবিত্ত। তখনো আযিযুল হক কলেজ সরকারি হয়নি, সেই বেসরকারি কলেজের বাংলার তরুণ অধ্যাপক আমার পিতাও আর্থিক বিচারে তার ওপরে কিছু নন। কিন্তু পোরবেসার সায়েবের ছোলপোল হিসেবে পাড়ায় আমরা কিছু আলাদা মর্যাদা ভোগ করি। এই মর্যাদা আরো একধাপ উঠে গেলো এক ঘটনায়। কী এক উপলক্ষে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বগুড়ায় এলেন। আব্বা তাঁর প্রিয় ছাত্রদের একজন, সেই সুবাদে এক দুপুরে তিনি আমাদের বাড়িতে আহার করবেন। খবরটি কী প্রকারে পাড়ায় প্রচারিত হয়ে গিয়েছিলো জানা নেই। নির্ধারিত দিনে আমাদের বাড়ির সামনে রীতিমতো ভিড় জমে গেলো ড. শহীদুল্লাহকে এক নজর দেখার জন্যে। তাঁর পাণ্ডিত্য ও ভাষাবিদ পরিচয় অল্প দু'চারজন ছাড়া আর কারো জানা নেই, কিন্তু পাঠ্য পুস্তকে যাঁর লেখা অন্তর্ভুক্ত হয় তিনি নিশ্চয়ই অনেক বড়ো মানুষ। এইসব মানুষের দর্শন প্রতিদিন মেলে না।

আকারে ছোটোখাটো মানুষটিকে দেখে মানুষ হতাশ হয়েছিলো কি না কে জানে! আমার মস্তকটি শরীরের তুলনায় কিঞ্চিৎ বড়ো দেখে পণ্ডিত মানুষটি নাকি বলেছিলেন, এ ছেলে তো বড়ো হয়ে সর্দার-টর্দার হয়ে যাবে!

আমার মনে নেই, আম্মার কাছে অনেকবার শুনেছি এই গল্প। সর্দার-টর্দার বলতে তিনি কোনোকিছুতে আমার নেতৃস্থানীয় কেউ একজন হওয়ার কথাই বুঝিয়ে থাকবেন। কিন্তু প্রবল পাণ্ডিত্যের সঙ্গে ভবিষ্যৎদ্রষ্টা হওয়ার সম্ভাবনা যে শূন্য, তা পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়ে গেছে। তাঁকে সর্বাংশে ভুল প্রমাণ করতে আমাকে কোনো চেষ্টাই করতে হয়নি, বিনা ক্লেশে সবার পেছনে থেকে গেছি বরাবর। এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেওয়ার মানুষের অভাব হবে না।

মাসুদ তখন কয়েক মাস বয়সী। ড. শহীদুল্লাহ তাকে কোলে নিতেই সে তাঁর সাদা পাঞ্জাবিতে তার বমনোদগীরণ-প্রতিভার স্বাক্ষর দিয়ে ফেলে। সেই বিড়ম্বনার গল্প মাসুদ সারা জীবনভর শুনে যাচ্ছে, পারিবারিক কেচ্ছাকাহিনীতে তা খোদাই হয়ে গেছে।

আমাদের প্রতিবেশীরা স্কুলশিক্ষক, উকিলের মুহুরি, কাঠমিস্ত্রি, শহরের বাজারে দোকানদার, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিচের দিকের চাকুরে – এই ধরনের বিচিত্র পেশার মানুষ। আমাদের বাড়ির উল্টোদিকে কসাইপাড়া। অল্প কয়েকটি পরিবার নিয়ে এই কসাইপাড়া। তাদের বাড়ির পেছনে প্রতিদিন ভোরে গরু-ছাগল-ভেড়া জবাই হয়। আমরা ছোটোরা যাতে এই নিধন-প্রক্রিয়া স্বচক্ষে না দেখি সে বিষয়ে আব্বা যত্নবান ছিলেন। তিনি নিজেও স্বচক্ষে এসব দেখতে পারতেন না, বাড়িতে মুরগি জবাইও না। কোরবানী ঈদের দিন জবাইয়ের সময় তিনি ঘরে এসে বসে থাকতেন।

কসাইপাড়ায় জবাই হওয়া এইসব গরু-ছাগল-ভেড়া ঠেলাগাড়িতে তুলে বাজারে নিয়ে যাওয়া হতো। তার আগেই আব্বা মাংস নিয়ে আসতেন। পরিমাণে বেশি নয়, তার কারণ দুটি। আব্বা আহারের ব্যাপারে অতিশয় খুঁতখুঁতে, প্রতিবেলার খাবার টাটকা রান্না হওয়া চাই যার ফলে আম্মার জীবনের অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয় রান্নাঘরে। দুই, ফ্রিজ নামে কোনো জিনিসের নামও তখন কেউ শোনেনি।

কসাইপাড়ার কসিমুদ্দিন আব্বার বিশেষ অনুরক্ত হয়ে যায়। স্যার যেহেতু বকরি বা ভেড়ার মাংস খান না, তরুণ বয়সী খাসির সেরা মাংস সে আলাদা করে রেখে দেয়। আব্বা নিজে না খেলেও ভালো গোমাংসও আসতো কসিমুদ্দিনের কল্যাণে।

কসিমুদ্দিনের গায়ের রং কালো হলেও এক ধরনের আভিজাত্যময়। তার চর্চিত পুরু গোঁফ এবং স্বাস্থ্যবান চেহারাটি আমার এখনো স্পষ্ট মনে পড়ে। তাকে সবসময় দেখতাম সাদা ধবধবে শার্ট আর পরিষ্কার লুঙ্গি পরা। পায়ে কাবলি জুতা। তার চোখ দুটি মায়াবী, স্বভাবে মৃদুভাষী। পেশার সঙ্গে তার চেহারা ও স্বভাবের মিল নেই। এই নিরীহ-নির্বিবাদী কসিমউদ্দিনকেও একাত্তরে যুদ্ধের সময়, কোন অপরাধে কে জানে, পাকিস্তানী সৈন্যদের হাতে প্রাণ দিতে হবে।

আমাদের বাড়ির বসার ঘরটি পশ্চিমমুখী, সামনের বারান্দা থেকে নেমে রাস্তা পর্যন্ত প্রায় বিশ গজের দূরত্বে। সাত-আট ফুট চওড়া এই পথটুকু ইট বিছিয়ে দেওয়া। তার দুইপাশে গাছ লাগানো হয়েছে। বাঁ দিকে কয়েকটি পেঁপে গাছ এবং একটি আম গাছ। ডানে একটি নিম গাছের কথা মনে আছে। এই দিকটাতে একবার ভুট্টা গাছ লাগানো হয়েছিলো, পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে তখন ভুট্টা চাষকে উৎসাহিত করা হচ্ছে। আব্বাই লাগালেন গাছগুলি। ভুট্টা হয়েছিলো প্রচুর। পুড়িয়ে খাওয়া হলো, বিজাতীয় এবং বিস্বাদ বস্তু – একটুও ভালো লাগেনি। তবে ভুট্টার খই মন্দ লাগেনি। এখন সেই জিনিসের নাম পপকর্ন!

বাড়িতেই বাংলা ও ইংরেজি অক্ষরজ্ঞান হলো আম্মার কাছে। গাঢ় গোলাপি রঙের মলাটে মদনমোহন তর্কালঙ্কারের শিশুশিক্ষা বাংলা শেখার বই। ইংরেজি বইটির কথা মনে নেই। আম্মার লেখাপড়া ক্লাস সেভেন পর্যন্ত। সেই আমলের বিচারে মন্দ নয়। আমরা ভাইবোনরা পরবর্তীকালে এই মর্মে একমত হই যে সুযোগ পেলে আম্মার পক্ষে ঘরকন্নার বাইরেও সত্যিকারের বড়ো কিছু করা হয়তো অসম্ভব হতো না।

আমাকে লিখতে বসিয়ে দিলে আমার আচমকাই বাচ্চুর কথা মনে পড়ে।
জীবনের প্রথম বন্ধুত্ব ও বিচ্ছেদের কথা লিখেছিলাম মনে আছে।
রফিক ভাই পরে একদিন বলেছিলেন,
এই চিঠি পড়ে বাচ্চু নাকি তাঁকে ফোন করেছিলো।

তার ফোন নাম্বারটি রফিক ভাই দেবেন বলেছিলেন, আর হয়ে ওঠেনি।
বাচ্চুর সঙ্গে আরেকবার যোগাযোগ ঘটে গেলে কেমন হতো কে জানে!

বাহির হয়ে বাইরে

বগুড়া আমার শহর, কিন্তু জন্ম রাজশাহীতে। একইভাবে প্রাথমিক শিক্ষা পি টি স্কুলে হলেও প্রথম স্কুল ইসলামিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়, সে স্কুলটি লুপ্তও হয়েছে অনেককাল আগেই। নামে ইসলামিয়া হলেও মাদ্রসা-মক্তব নয়, অন্যসব প্রাইমারি স্কুলের মতোই এই প্রতিষ্ঠানটি ছিলো এখন যেখানে সিটি গার্লস হাই স্কুল, তার ঠিক পাশে। সিটি গার্লস স্কুল অবশ্য তখনো হয়নি, সেই জায়গাটি খালি পড়ে ছিলো।

আমাদের পাশের বাড়ির তারা-হেলাল দুই ভাই ইসলামিয়া স্কুলে পড়ে। তারার বয়স আমার চেয়ে কিছু বেশি, হেলাল সামান্য ছোটো। ওদের দেখাদেখি ওই স্কুলেই যাওয়া সাব্যস্ত হলো। ওদের সঙ্গেই স্কুলে গেলাম, জীবনে প্রথম স্কুলে যাওয়ার কী উত্তেজনা। সেই উত্তেজনা মরে গেলো স্কুলে যাওয়ার পর। স্কুল বলতে যে ধারণা এতোদিন মনে মনে ছিলো তার সঙ্গে একটুও মেলে না। স্কুল বলতে এখানে বেশ বড়োসড়ো একটি ঘরের একেক কোণে একেক শ্রেণীর ছেলেমেয়েরা বসা, তাদের সামনে একজন করে শিক্ষক। সে এক মহা হট্টগোলের জায়গা। বাড়ি ফিরে আম্মাকে বললাম, এই স্কুল ভালো না, আমি আর যাবো না।

যাইনি। আব্বাও পাঠাতে চাননি। ফলে আরো কিছুকাল ঘরেই বিদ্যাশিক্ষা। পরের বছর আমি এবং ঝর্ণা একসঙ্গে পি টি স্কুলে ভর্তি হই। স্কুলের পুরো নাম প্রাইমারি ট্রেনিং ইনসটিটিউট, প্রাথমিক স্কুলশিক্ষকদের প্রশিক্ষণের জায়গা। এখানকার ক্ষুদে বালক-বালিকারা এক অর্থে এই প্রশিক্ষণার্থীদের গিনিপিগ।

আমি ভর্তি হই সরাসরি ক্লাস টুতে, ঝর্ণা ওয়ানে। বাড়ি থেকে স্কুল ক্ষুদে পায়ে হেঁটে পাঁচ মিনিটের পথ। প্রথম প্রথম দুই ভাইবোন একসঙ্গে যাই, আসি। অবিলম্বে এই জ্ঞান অর্জিত হলো

যে বালক-বালিকার পৃথিবী আলাদা, ঠিক কীভাবে তা অবশ্য জানা নেই, এবং ভাইবোন হলেও একসঙ্গে যাতায়াত খুব কাজের কথা নয়। তার ওপরে বোন আবার আস্ত এক ক্লাস নিচে। ফলে আমাদের পৃথিবী আলাদা হতে শুরু করলো।

তা অবশ্য শুধুমাত্র স্কুলে এবং বাড়ির বাইরে, বাড়িতে তখনো আমরা পরস্পরের খেলার সঙ্গী, ঝগড়া-বিবাদেরও। রাতে ঘুমাই এক বিছানায়, শুয়ে শুয়ে স্কুলের সহপাঠীদের নামের তালিকা বিনিময় করি। ঘুমাতে যাওয়ার আগে আমাদের আরেকটি প্রিয় আলোচ্য বিষয় ছিলো, সহপাঠীদের কার বাবা সবচেয়ে বড়োলোক। এখনকার জেলার ডি সি-দের তখন বলা হতো ডি এম বা ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট। ডি এম-এর ছেলে বা মেয়ে ঝর্ণার সঙ্গে পড়তো। সুতরাং ডি এম সাহেব বরাবর ধনীদের তালিকার শীর্ষে। তখন আমাদের পৃথিবীতে ডি এম এতোটাই বড়ো! তবে আমরা যে বড়োলোক শ্রেণীভুক্ত নই, তা পরিষ্কার জানা হয়ে গিয়েছিলো।

তখনো আমাদের বাড়িতে বিদ্যুতের আলো আসেনি, হ্যারিকেনই ভরসা। বড়ো রাস্তায় ল্যাম্পপোস্টে বিদ্যুতের আলো জ্বলে। ছোটো রাস্তাগুলোতে পৌরসভার লোক এসে সন্ধ্যার সময় অনুচ্চ ল্যাম্পপোস্টে অনুজ্জ্বল বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে যায়, ভোরে আসে নিবিয়ে দিতে। সংখ্যায় অল্প হলেও তখন বগুড়া শহরে ঘোড়ার গাড়ি চলে, সেগুলো টমটম নামে পরিচিত। হাতেগোনা কিছু রিকশা। পুরনো চেহারার ট্রাক-বাস চলে, হেলপাররা গাড়ির সামনে দ-সদৃশ লোহার হ্যান্ডল সজোরে না ঘোরালে স্টার্ট নেয় না, মাঝেমধ্যে তাতেও কাজ না হলে বাস-ট্রাকের মাথার খুলি উল্টে পানি ঢালতে হয়। শহরে প্রাইভেট গাড়ি একটা-দুটো, পাশ দিয়ে গেলে অন্য সবার মতো আমরাও হাঁ করে তাকিয়ে দেখি।

স্কুলে ছেলেমেয়েদের মধ্যে আমার প্রথম বন্ধু হয় বাচ্চু নামের একটি ছেলে। পুরো নাম ওবায়দুর রহমান। তার বাবা ছিলেন বগুড়ার এসডিও। মালতীনগর বকশীবাজারের কাছে বাচ্চুদের সরকারি বাড়িটি যখন চিনেছি তার আগেই বাচ্চুর সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ছিন্ন হয়েছে। তার বাবার বদলির চাকরির কারণে তাদের চলে যেতে হয় অল্পদিনের মধ্যে। যাওয়ার সময় বাচ্চু আমাকে একটি কলম দিয়েছিলো, অনেকদিন যত্নে রক্ষা করেছিলাম কলমটি। তারপর কোথায় কীভাবে হারালো মনে নেই। অনেক বছর পরে সাপ্তাহিক রোববার পত্রিকার প্রথম সংখ্যার প্রস্তুতি চলছে, সেই সময় একদিন সেখানে গেছি। রফিক আজাদ ধরে বসিয়ে দিলেন, পাঠকের চিঠির পাতার জন্যে একটি চিঠি লিখে দিতে হবে। যে কাগজ প্রকাশিতই হয়নি, তার পাঠকের সত্যিকারের চিঠি পাওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং রফিক ভাই যাকে সামনে পাচ্ছেন তাকে দিয়ে দুই কলম লিখিয়ে নিচ্ছেন। আমাকে লিখতে বসিয়ে দিলে আমার আচমকাই বাচ্চুর কথা মনে পড়ে। জীবনের প্রথম বন্ধুত্ব ও বিচ্ছেদের কথা লিখেছিলাম মনে আছে। রফিক ভাই পরে একদিন

বলেছিলেন, এই চিঠি পড়ে বাচ্চু নাকি তাঁকে ফোন করেছিলো। তার ফোন নাম্বারটি রফিক ভাই দেবেন বলেছিলেন, আর হয়ে ওঠেনি। বাচ্চুর সঙ্গে আরেকবার যোগাযোগ ঘটে গেলে কেমন হতো কে জানে!

এখানে আমার সহপাঠী জাফর ও খসরুর সঙ্গে যোগাযোগ অনিয়মিত হলেও আজও বন্ধুত্ব অটুট। ফারুখ ফয়সলও তাই। তার কথা অবশ্য একটু আলাদা করে উল্লেখ করা দরকার এইজন্যে যে আমরা পুরুষানুক্রমে বন্ধু। তার এবং আমার পিতা একই অঞ্চলের মানুষ, তাঁদের পড়াশোনা খঞ্জনপুর হাই স্কুলে, বগুড়া আযিযুল হক কলেজ হয়ে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্য পড়লেন দু'জনেই, পাঠশেষে দু'জনেই অধ্যাপক হলেন আযিযুল হক কলেজে। ফারুখ ফয়সলের সঙ্গে আমারও অনেকটা সেরকমই হয়েছিলো অনেকদূর পর্যন্ত। আরেকজন ছিলো আক্কু, তার কলেজ-পড়ুয়া বড়ো ভাইয়ের নাম পেস্তা, ছোটো ভাই টিটু আমাদের এক ক্লাস নিচে পড়ে। পেস্তা ও টিটু এই কাহিনীতে পরে ফিরে আসবে।

মনে আছে পাকা-পাকা ভাব করা ছোটো চুলের মামুন, ভালো ফুটবল-খেলা খোকা, ফ্যাকাশেমতো ফর্সা নিরীহদর্শন গোলগাল মুখের সোবহান, ফর্সামুখ রব্বানীর কথা। রব্বানীর দুলাভাই আমাদের স্কুলে ড্রইং-এর শিক্ষক হুদা স্যার। অসাধারণ সুদর্শন সুপুরুষ ছিলেন স্যার, অনায়াসে চোখের পলকে একেকটা ছবি এঁকে ফেলতেন, আমরা বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে তাকিয়ে থাকি। একবার স্কুরের এক ফাংশানে 'শান্ত নদীটি পটে আঁকা ছবিটি' গানের সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চে একটি বোর্ডে হুদা স্যার গানে বর্ণিত দৃশ্যগুলি এঁকে যান। গান শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ছবিও শেষ। মানুষ এতো সুন্দর কী করে আঁকে! ছবি আঁকার বাসনা আমার চিরকালের, মনে মনে পারি, হাতে আঙুলের ডগায় আনা সম্ভব হয়ে ওঠেনি কোনোদিন। স্কুলে ড্রইং ক্লাসে আমি বরাবর খারাপ করতাম। একেকদিন শিক্ষকসহ দল বেঁধে আমরা কাছাকাছি কানছগাড়ির পুকুর থেকে কাদামাটি এনে সেই মাটি দিয়ে কিছু একটা বানাতে হতো। আমারটা কোনোকালে কিছু হয়ে উঠতো না – আম বানাতে গেল পেঁপে হয়ে যায়।

ক্লাসের ফারুক তালুকদারের বাবা ছিলেন মৌলভী, মিলাদ পড়ানোর সময়, কোরবানীর দিনে তাঁর ডাক পড়তো। সোবহানদের বাড়ি স্কুল সংলগ্ন, তার মা শহরে মেয়েদের সবচেয়ে ভালো স্কুল ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, সংক্ষেপে ভি এম, গার্লস হাই স্কুলের শিক্ষিকা, বড়ো ভাই খোকন তখন সম্ভবত কলেজের ছাত্র। ছোটো বোনটি, আফরোজ জাহান, আমাদের স্কুলেই পড়ে, সম্ভবত ঝর্ণার সঙ্গে।এই মেয়েটি ছড়া এবং ছোটোদের লেখালেখি কিছু করেছিলো, তারপর তার কী হলো আর জানি না। তাদের ভি এম স্কুলে পড়া বড়ো বোন রুনু বিকেলবেলা পি টি স্কুলের মাঠে একা একা সাইকেল চালায়। বগুড়ার মতো শহরে ওই সময়ে রুনু আপা ছাড়া আর কোনো মেয়েকে

সাইকেলে চড়তে দেখিনি। এই রুনু আপা অল্প কিছুকাল পরে আমাকে সাইকেল চালানো শেখাবেন।

সহপাঠিনীদের মধ্যে দু'জনের কথা মনে পড়ে। ভুল হলো, আসলে তিনজন। প্রথম দু'জনের নাম বেলা ও হাসি। ক্লাস টু-এর ফাইনাল পরীক্ষার ফলাফলে দেখা যায়, তিনজন ছাত্রছাত্রীর সর্বমোট নম্বর একই সমান। এই তিনজনের মধ্যে বেলা ও আমি আছি, তৃতীয়জন কে ছিলো, বাচ্চু? না, হাসি? মনে নেই। শেষ পর্যন্ত কোন বিবেচনায় কে জানে, আমাকেই প্রথম ঘোষণা করা হয়, তৃতীয় শ্রেণীতে উঠে আমার রোল নম্বর এক। জীবনে ওই একবারই, আর কখনো লেখাপড়ায় তো নয়ই, কোনোকিছুতেই আর প্রথম হইনি। শীর্ষেন্দুর একটা গল্পে যেমন ছিলো, 'বাঘটা একবারই বেরিয়েছিলো...'। আমাকে প্রথম ঘোষণা করায় বেলার অসন্তুষ্ট পিতা স্কুলে কিছু হৈ চৈ করেছিলেন মনে আছে। তখন মনে হতো, বেলাকেই কেন প্রথম করা হলো না!

বেলা-হাসির সেই ছোটোকালের মুখ আবছা মনে আছে। পি টি স্কুল পেরোনোর পর হাসিকে আর কোনোদিন দেখেছি বলে মনে পড়ে না। একই পাড়ার বাসিন্দা হিসেবে বেলাকে ভি এম স্কুলের ইউনিফর্ম পরে যেতে দেখেছি। আমরা আবার বাড়ি বদল করার পর আর দেখা হয়নি। তৃতীয় যে সহপাঠিনীর কথা মনে আছে তার নাম মনোয়ারা। ক্লাস টুতে ভর্তি হয়েই পেলাম তাকে, ক্লাসের অন্যসব বালক-বালিকার তুলনায় দেখতে বড়োসড়ো সে। বয়সেও সম্ভবত। ক্লাস টুতে পড়ার সময়ই পরপর কয়েকদিন মনোয়ারা অনুপস্থিত। শোনা যায়, আর স্কুলে আসবে না সে। কেন? স্কুলে আসার আর দরকার নেই, তার বিয়ে হয়ে গেছে!

আমার দশ বছর বয়সী পুত্রের একটি প্রিয় কৌতূহলের বিষয় তার বাবার ছেলেবেলা। আমি যখন তার বয়সী সেই সময়ে আমাদের বাড়িতে রেডিও বলে কিছু ছিলো না, বিদ্যুৎ না, টেলিভিশনের নাম আমরা জানি না, ভিডিও গেম বলে কোনো বস্তু মানুষের কল্পনায়ও নেই – এইসব কাহিনী তার কাছে অবিশ্বাস্য ও অতি অবাস্তব লাগে। মন্দ অর্থে বলছি না, আজকাল এমনকি মফস্বল শহরের শিশুরাও এসব চেনে জন্মের সময় থেকেই, ব্যবহারের সামর্থ্য থাকা-না-থাকার বিষয় আলাদা থাক। এইসব হয়েছে সময়ের টানে, সময়ের প্রয়োজনে, মানুষের উদ্ভাবনী শক্তির ফসল হিসেবে এবং এইসবের ব্যাপক প্রচলনের ফলে। তবে বললে বোধহয় খুব ভুল হবে না যে, মায়ের মুখের চেয়ে টিভির পর্দায় আজকের শিশুদের চোখ বেশি নিবদ্ধ থাকে।

আলোহীন, জৌলুসহীন এবং আপাত-বিনোদনবিহীন শৈশবে আমরা অবশ্য খুব নিরানন্দ ছিলাম না। মানুষ হয়তো শেষ বিচারে তার পরিবেশ-প্রতিবেশের সন্তান। তার চারপাশে সে উপযুক্ত ও শ্রেষ্ঠ আনন্দের উপকরণ সন্ধান করে এবং আহরণ করতেও সমর্থ হয়। আমরাও পেরেছিলাম।

এইসব বিষয়ে এক সময়ের সঙ্গে আরেক সময়ের তুলনা চলে না। আমার পিতা বড়ো হয়েছেন গ্রামে, তাঁর শৈশবের সঙ্গে আমারটা কিছুতেই মেলে না। আমার সময়ের সঙ্গে আমার পুত্রের শৈশব ঠিক ততোটাই বা ততোধিক পরিমাণে আলাদা। এখানে ধারাবাহিকতা বা পরম্পরা খুঁজতে যাওয়া অর্থহীন পণ্ডশ্রম।

সময় ষাট দশকের প্রথমার্ধ। তখন আমাদের জীবনে প্লাস্টিক নামের একটি বস্তুর অনুপ্রবেশ ঘটছে। বিশুদ্ধ সুতির যুগ পার হয়ে ক্যারিলন-টেরিলিন শার্ট পরনে উঠছে আমাদের। প্রেসিডেন্ট নামের ঢাউস মোটা ফাউন্টেন কলম এসেছে, সেই কলমে ব্যবহার্য চীনের তৈরি ইয়ুথ নামের কালো ও নীল দোয়াতের কালি। পেন্সিলে পাকিস্তান ক্রিকেট টীমের খেলোয়াড়দের ছবি উৎকীর্ণ – জাভেদ বারকি, হানিফ মোহাম্মদ, ইনতেখাব আলম, মোশতাক মোহাম্মদ। তখন শহরাঞ্চলে বাসাবাড়িতে খড়ির চুলা ও কয়লার চুলার পাশাপাশি আসতে শুরু করেছে কেরোসিনের স্টোভ।

পরিবারের সদস্যদের মাথার হিসেবে রেশনকার্ড দিয়ে প্রতি সপ্তাহে লাইনে দাঁড়িয়ে বরাদ্দের চাল, ময়দা, চিনি এবং যতোদূর মনে পড়ে কেরোসিন তেলও পাওয়া যায়। আমাদের বাড়িতে অবশ্য রেশনের চাল খাওয়া হতো না, প্রধানত চিনি ও ময়দা নেওয়া হতো। পাড়ার রেশন দোকানের ডীলার কফিলউদ্দিনের বড়ো ছেলে, নাম সম্ভবত পল্টু, কলেজে আব্বার ছাত্র। আরেক পুত্র এনামুল কবির পরে জেলা স্কুলে আমার সহপাঠী হয়।

আমেরিকা থেকে রিলিফের গম আর গুঁড়ো দুধ আসে, তাই দিয়ে পি টি স্কুলে আমাদের জন্যে খিচুড়ি ও পায়েসের টিফিন তৈরি হয়। গমের খিচুড়ি-পায়েস আগে কোনোদিন কেউ খায়নি। পানিতে গোলানো গুঁড়ো দুধের পায়েস মুখে দেওয়া যেতো না, অতি জঘন্য তার স্বাদ-গন্ধ। গরম খিচুড়ি খেতে খুব খারাপ লাগতো না, গমের অচেনা কিন্তু নতুন গন্ধটা ভালো।

চৌরাস্তার মোড়ে পি টি স্কুলের ঠিক কোণাকুনি একটি দোকান। একপাশে মুদিখানার যাবতীয় সদাইয়ের পসরা, আরেকপাশে চা-মিষ্টি-সিঙাড়ার দোকান। মালিকের নাম কিয়ামউদ্দিন, কিয়ার দোকান বলে সবাই চেনে। দোকানের সামনে একটি গাছতলায় গোটাদুয়েক রিকশা দাঁড়ানোর জায়গা। একটি রিকশার পেছনে বড়ো করে লাল রঙে লেখা ৩, তার দু'পাশে ভাগাভাগি করে কালো হরফে লেখা বগুড়া পৌরসভা। অর্থাৎ শহরের তিন নম্বর রিকশা। এই রিকশার মালিক-কাম-চালক আকবর মিয়া। কাঁচা-পাকা চুল পরিপাটি করে আঁচড়ানো, সাদা চেক লুঙ্গি আর পরিষ্কার গেঞ্জি পরা রীতিমতো সম্ভ্রান্ত চেহারার আকবর মিয়াকে দেখলে রিকশাওয়ালা বলে অনুমান করা শক্ত। কিয়ার দোকানের পেছনেই তার বাড়ি। ছেলে বাদশা ঢাকায় পড়ে। মাঝে-

মধ্যে ছুটিছাটায় আসে। ঢেউ খেলিয়ে আঁচড়ানো চুল আর ইস্ত্রি করা প্যান্ট-শার্ট পরে বিকেলে বেড়াতে বের হলে বাদশাকে তখন দেখতে বেশ রাজপুত্র-রাজপুত্র লাগে।

এ পাড়ায় আসার পর থেকে আমাদের বাঁধা রিকশাওয়ালা আকবর মিয়া। আম্মা কোথাও যাবেন, ডাকো আকবর মিয়াকে। আমিই যেতাম ডাকতে। ডেকে কিয়ার দোকান থেকে বাড়ি পর্যন্ত ফেরার পথে একা রিকশা চড়ার আয়েশ। নিজেকে তখন বেশ বড়ো বড়ো লাগে। নানাবাড়ি বা দাদাবাড়ি যাওয়ার জন্যে রেলস্টেশনে পৌঁছে দেওয়ার জন্যে আগেই খবর দেওয়া থাকতো, ঠিক সময়মতো আকবর মিয়া বাড়ির সামনে এসে হর্ন বাজাবে, তখনো রিকশায় হর্ন ব্যবহার করা হয়। দরকার হলে আরেকটি রিকশাও সে-ই ধরে আনে। কিছুদিন পরে আমাদের আবার বাড়ি বদল হবে, নতুন পাড়ায় আকবর মিয়ার জায়গা নেবে সুবরতি। লোকটা কোথাকার জানা যায় না, বাংলা বলে ভাঙা ভাঙা। সবাই বলে বিহারী।

কিয়ার দোকান থেকে আমাদের বাড়ির দৈনন্দিন সদাইপত্র কেনা হয়। আটা-ময়দা, পাঁউরুটি (রুটিতে মাখনের ধারণা মধ্যমশ্রেণীতে তখনো আসেনি), ডালডা, কেরোসিন তেল, শর্ষের তেল (ভেজিটেবল বা পাম অয়েল তখনো দূরস্ত), সাবান এইসব। দিস্তা হিসেবে ফুলস্কেপ কাগজ, পেন্সিল, রুলটানা খাতা। বেশি ভারী কিছু না হলে আমি যাই কিনতে। এই দোকানে বাকির খাতায় আব্বার নামে একটি পাতা বরাদ্দ থাকে। নগদ লেনদেনের দরকার নেই। যা কেনা হলো, আমার উপস্থিতিতেই খাতায় লেখা হয়ে গেলো। মাসের এক তারিখে বেতনের টাকা আব্বার হাতে আসে, রেডিওতে আইয়ুব খানের মাসপহেলা বেতার ভাষণের মতো। সেদিন কিয়ার দোকানে বাকির হিসেব শূন্য থেকে শুরু হতো আবার।

আমাদের বাড়িতে চায়ের চল ছিলো না, কিয়ার দোকান থেকে কালেভদ্রে চা-পাতা কেনা হতো। বস্তুত, চা, পান, সিগারেট কোনোরকম নেশার দ্রব্যই আমাদের বাড়িতে নেই তখন। চা-পাতা কেনা হতো অতিথিদের জন্যে। প্রতিদিন বিকেলে আব্বার তাস খেলার আসর, খেলার পার্টনারদের একেকজনের বাসায় খেলা হয়। আমাদের বাসায় হলে তাসারুদের জন্যে আম্মা চা বানিয়ে দিলে আমি ট্রেতে করে নিয়ে যাই। ওই অছিলায় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে খেলা দেখি, যতোক্ষণ না আব্বা খেয়াল করে ভেতরে যেতে না বলতেন। তাসের আসরের কারো সিগারেট শেষ হলেও ডাক পড়ে, আবার কিয়ার দোকানে। সিগারেট এনে দিয়ে আরেক দফা দাঁড়িয়ে তাস খেলা দেখার সুযোগ। দেখে দেখেই অকশান ব্রীজের নিয়মকানুনগুলো আমার শেখা হয়ে যায়।

কিয়ার দোকানে যাওয়া-আসার সময় বেলাদের বাড়ির পরে জাকারিয়া ভাইদের বাড়ি। সেই বাড়ির দোতলায় একটিমাত্র ঘর, সেখানে জাকারিয়া ভাই থাকেন। তাঁর পিতা তসলিম তালুকদার

আসলে পালকপিতা। জাকারিয়া ভাই আসলে আমার সহপাঠী ফারুক তালুকদারের সহোদর, ফারুকের চাচা তসলিম তালুকদার নিঃসন্তান বলে ভাইয়ের একটি পুত্রকে দত্তক নিয়েছিলেন। জাকারিয়া ভাই শরীরচর্চায় অতি মনোযোগী ছিলেন। দেখার মতো শরীর ছিলো, জানতেন বলে বেশিরভাগ সময় খালি গায় বা শুধু একটা স্যান্ডো গেঞ্জি পরে থাকতেন। তাঁর দোতলার ঘরের খোলা দরজা দিয়ে দেখা যায়। একবার শহরের শরীরচর্চাবিদদের প্রতিযোগিতা হয় জেলা স্কুলের মাঠে। মি. বগুড়া নির্বাচন করা হবে। পাড়ার ছেলে জাকারিয়া ভাইয়ের দিকে আমার সমর্থন। কিন্তু তিনি হলেন রানার আপ, মি. বগুড়া হয়েছিলেন কাটনারপাড়ার আবদুল জলিল। তাতে কিছু এসে যায় না। জাকারিয়া ভাই অনেককাল আমার হিরো ছিলেন। শরীরচর্চা করে তাঁর মতো শরীরের মালিক হওয়ার বাসনা দীর্ঘকাল ছিলো। এ জন্মে তা হয়ে উঠলো না। চর্চার জন্যে শরীরটিকে জায়গামতো নিয়ে যেতে হবে, সেটি করে দেবে কে!

সদাইপাতির জন্যে কিয়ার দোকানে যাওয়া শুধু নিয়মপালন মাত্র। আমার আকর্ষণ ছিলো অন্যত্র। বাড়িতে ক্ষণকালের অতিথি, অর্থাৎ রাত্রিবাস করবে না এরকম কেউ এলে রীতি ছিলো মিষ্টি দিয়ে আপ্যায়ন করার। ব্রীজ খেলোয়াড়রাও এই শ্রেণীভুক্ত হতেন প্রায়ই। যেহেতু তখন ফ্রিজ বলে কোনো জিনিস ছিলো না, জিনিসটি প্রয়োজনের সময়ই কিনে আনতে হবে। অভ্যাগতরা এলে আমি অপেক্ষা করি কখন টিফিন ক্যারিয়ারের একটি বাটি হাতে মিষ্টি আনার ডাক পড়বে। এএককটা মিষ্টির দাম দুই আনা, তখনো দশমিকের হিসেব চালু হয়নি, ষোলো আনায় এক টাকা হয়। অতিথিরা সংখ্যায় বড়ো না হলে এক টাকার মিষ্টিতেই কাজ চলে যায়। কিয়ার দোকানে এক টাকার মিষ্টিতে একটা ফাও পাওয়া যায়। ওই নয় নম্বর মিষ্টি দোকান থেকে বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছায় না, ফেরার পথে সেটি উধাও হয়ে যায়। অতিথি বিদায় হলে উদ্বৃত্ত থেকে ভাগ আমরা সবাই পেতাম, আমার জন্যে হয়তো সেটাই সত্যিকারের ফাও। কারণ অতিথি সৎকারে সব মিষ্টি শেষ হয়ে গেলেও আমার লোকসান কিছু নেই!

এক অর্থে এটিই জানামতে আমার প্রথম অপরাধমূলক কাজ! এখন ভাবি, এই বুদ্ধি আমার মাথায় কী করে এসেছিলো? শান্তশিষ্ট ভালো ছেলে বলে সবাই জানে, নিজেও তাতে কিছু আত্মপ্রসাদ ভোগ করি। তবু ছিঁচকে চুরিতে আমার হাত উঠলো। এমন নয় যে মিষ্টিতে আমার বিশেষ আসক্তি ছিলো। আসলে আজও নেই। তাহলে? উত্তর হয়তো এই যে ওই বালক বয়সে একটু লুকোচুরির রোমাঞ্চ আমার দরকার ছিলো। কোথাও কোথাও তো আমাকে জিততে হবে!

ভালো ছেলে বলে পরিচিত হওয়ার ফলে স্কুলে শিক্ষকদের কাছে কিছু বাড়তি প্রশ্রয় পাওয়া যেতো। কিন্তু সহপাঠী ও স্কুলের অন্য বালকদের কাছে সমীহ জুটলেও নিতান্ত নিরামিষ আমি, সে

অর্থে চালু ছেলে নই মোটেই। আমি তখনো দ্বিতীয় ক্লাসে, একদিন উঁচু ক্লাসের এক বালক ছুটির সময় আমাকে শাসিয়ে বলে, কাল চার আনা প'সা দিবু হামাক।

রীতিমতো আদেশ জারি। এই বালক ক্লাস ফাইভে পড়ে। ডানপিটে বলে খ্যাতি আছে, স্কুলের সবাই তাকে চেনে। নাম মঞ্জু। তার ছোটো ভাই বাবলু ক্লাস ফোরে, অত্যন্ত নিরীহ ছেলে এবং ভালো ছাত্র। তাদের পিতা এই স্কুলের শিক্ষক মিজানুর রহমান, অত্যন্ত উঁচুমানের মানুষ ও শিক্ষক। কিছুদিন আমাকে এবং ঝর্ণাকে প্রাইভেট পড়িয়েছিলেন মিজান স্যার। তাঁর পুত্র হিসেবে বাবলু মানানসই, মঞ্জুকে মানতে কষ্ট হয়।

একটি তথ্য তখন জানা ছিলো না, জেনেছি অনেক পরে। ষাটের দশকের শেষার্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এনএসএফ-এর ত্রাস হিসেব নাম শোনা যেতো খোকা-পাঁচপাত্তুর। ছবিতে দেখেছি চশমাপরা খোকা নিরীহদর্শন মেধাবী ছাত্রের প্রতিমূর্তি খোকা। সে নাকি গলায় সাপ ঝুলিয়ে প্রকাশ্যে ঘোরাফেরা করতো। আইয়ুব ও মোনেম খানের হয়ে অনেক অপকর্ম সংঘটিত করেছিলো খোকা-পাঁচপাত্তুরা। সম্ভবত ঊনসত্তরের এক সকালে খোকার লাশ পাওয়া যায় রমনা রেসকোর্সের (এখনকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যান) পাশে। এই খোকা ছিলো আমাদের মিজান স্যারের জ্যেষ্ঠ পুত্র, মঞ্জু-বাবলুর ভাই।

চার আনা পয়সা দাবি করে বসার আগে মঞ্জুর সঙ্গে কখনো কথা হয়নি। আমাকে তার চেনারও কোনো কারণ নেই। কিন্তু এই ধরনের প্রতিভাবান বালকেরা বোধহয় ঠিক গন্ধ পেয়ে যায়, ঠিক কার ওপরে দাপট দেখানো যাবে।

এখন আমার হলো মহাবিপদ। চার আনা পয়সা পাই কোথায়? একবারও মনে হয়নি, চাইলেই ওকে আমি পয়সাটা কেন দেবো। মঞ্জু বলেছে, সুতরাং দিতে হবে। শিক্ষকদের কাছে নালিশ করা যায়, কিন্তু প্রমাণ কী? মঞ্জু সরাসরি অস্বীকার করলে? করবে জানা কথা। কিন্তু তারপর? তার সঙ্গে পরে আমার দেখা হবেই, সে আমাকে খুঁজে বের করতে পারবে সহজেই। তখন?

পরদিন স্কুলে আসার আগে আম্মার কাছে কান্নাকাটি করে চার আনা পয়সা আদায় করতে সক্ষম হই। চার আনা তখন অনেক পয়সা, ছ'আনায় একসের চাল হয়। আম্মার জেরার উত্তরে শুধু বলি, দরকার আছে। স্কুলে যতোক্ষণ ক্লাস ততোক্ষণ ভয় নেই। টিফিন পিরিয়ডে কাঁটা হয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে ঘুরে বেড়াই। মঞ্জুর সামনে পড়িনি। মনে হয় ছুটির পর আর রক্ষা নেই। যদিও আমার পকেটে তার দাবি করা পয়সা আছে, চাইলেই দিয়ে দিতে পারি। তবু ভয় যায় না। একসময় মনে হয়, আচ্ছা ওকে আমি পয়সাটা দেবো কেন? ছুটির পর আমাদের ক্লাসরুমের

পেছনে দেওয়ালের পাশে কাঁঠাল গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকি কিছুক্ষণ। একটু পরে উঁকি দিয়ে দেখি মঞ্জু স্কুলের গেটে, বেরিয়ে যাচ্ছে তার দলবল নিয়ে। সে চোখের আড়াল হলে আমি বাড়ি ফিরি।

পরদিন মঞ্জুর মুখোমুখি পড়ে যাই। একটু ভয় ভয় লাগে, যদিও সেই চার আনা পকেটে তখনো আছে আমার। কিন্তু সে যেন আমাকে চেনে না, কখনো দেখেইনি – এইভাবে পাশ কাটিয়ে চলে যায়। ঘটনাটি কিছুই নয়, তবু আমার ভেতরের অকারণ ভয়ের বোধটুকু বেরিয়ে এসেছিলো বলে এখন বুঝতে পারি। ভালো ছেলে হওয়ার বিড়ম্বনা টের পাচ্ছিলাম।

এর কাছাকাছি সময়ে আরেকটি ঘটনা ঘটে। একদিন সকালে সারা শহরে প্রচারিত হয়ে যায় যে দুই জোড়া যুবক-যুবতী গতরাতে শহর থেকে উধাও হয়ে গেছে। তখন বোঝার বয়সও হয়নি, প্রেমের কারণে শুধু উধাও হওয়া নয়, মানুষ আরো অনেককিছু করে, করতে পারে। জোর গুজব ও জল্পনা হয় এইসব নিয়ে, দিনকয়েক পর দুই জোড়া নতুন দম্পতির আবির্ভাব ঘটে শহরে। একটি জুটিতে ছিলেন আমাদের আয়েশা ভিলার দু'পাশের দুই বাড়ির ঝর্ণা খালাম্মা এবং বাচ্চু মামা। দ্বিতীয়টির পাত্রপাত্রীর নাম দুলু ও মিনি। এই দু'জনও আব্বার কলেজের ছাত্রছাত্রী। মিনির বাড়তি পরিচয়, তিনি আমাদের মিজান স্যারের মেয়ে, খোকা-মঞ্জু-বাবলুর সহোদরা।

দিনের বেলায় কালাম ভাই গান গাইতেন না, শিসও দিতেন না।
...একেকটা ধাপ সামনে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে পেছনের পায়ের গোড়ালিটি
কেমন উঁচু হয়ে সামান্য লাফিয়ে ওঠে, মনে হয় যেন নাচতে নাচতে যাচ্ছেন।
...তাঁর ওই হাঁটার ভঙ্গিটি এবং গভীর রাতের শিস তাঁকে বিশিষ্ট করেছিলো আমার বাল্যকালে।

আঠারো- ঊনিশ বছরের ব্যবধানে কালাম ভাইয়ের সঙ্গে একবার দেখা হয়েছিলো।
ঠিক দেখা হওয়া বলা চলে না বোধহয়।
তিনিও আমাকে দেখেছিলেন নিশ্চিত, কিন্তু হয় চিনতে পারেননি
অথবা চিনতে চাননি।

নানা রঙের মানুষগুলি

খোকা চিনাবাদাম, খোকা চিনাবাদাম
টিনের মধ্যে বাদাম, চিনাবাদাম।

এই চিনাবাদাম-কাব্যের রচয়িতা আমাদের পাড়ার শুক্কুর আলীর। শুধু রচনা নয়, সুরারোপ ও গাওয়ার কাজটিও স্বয়ং সে-ই করে। সবাই তাকে শুকরা ডাকে। ঠেলাগাড়ি চালাতো সে। শুকনো পাটকাঠির মতো শরীর, তোবড়ানো গালমুখ, থুতনিতে অল্প দাড়ি। অশক্ত শরীর-স্বাস্থ্য নিয়ে ঠেলাগাড়ি চালানোর পরিশ্রম তার জন্যে দুরূহ হয়ে ওঠে। মাঝেমধ্যে অসহ্য পেটে ব্যথা হয়, তখন আর কিছু করা সম্ভব হয় না। এই শুকরা একদিন নতুন পোশাকে আবির্ভুত হয়। কোথা থেকে জোগাড় করেছিলো কে জানে, পরনে তালি দেওয়া ফুলপ্যান্ট, পুরনো চক্কর-বক্কর শার্ট, গলায় কাপড়ের চওড়া ফিতে দিয়ে আড়াআড়ি ঝোলানো রং-করা পুরনো কেরোসিনোর টিন। মাঝখানে একটা জায়গা গোল করে কেটে ঢাকনা বানানো। তার ভেতরে চিনাবাদাম। স্বরচিত গান গেয়ে সে পাড়া মাথায় তুলে ফেললো। বিচিত্র পোশাকের কারণে হোক বা তারস্বরের গানের কারণে, তাকে ঘিরে বালক-বালিকা, এমনকি বয়স্করাও ভিড় করতে লাগলো। মন্দ নয় শুকরার নতুন জীবন ও পেশা। পেটের ব্যথাটি অবশ্য তাকে ছেড়ে যায় না, মাঝেমধ্যে অকস্মাৎ আক্রমণ করে বসে। তখন গান ও বাদাম বিক্রিতে বিরতি দিয়ে শুকরাকে কাতর মুখে বসে থাকতে হয়। তখন জানি না, পরে এই উপসর্গটি আলসার বলে জানা হয়।

আমাদের বাড়ির ঠিক উল্টোদিকের বাড়ির ভদ্রলোকের নাম ময়েজউদ্দিন। তাঁর পেশা কী ছিলো মনে পড়ে না। বাড়ির সামনে মাথাসমান উঁচু মাচা করে লাউ-কুমড়া-সীম ইত্যাদি ফলাতেন।

নিচে বেগুন-টমেটো-শসা-মরিচ। তাঁকে ভাবলে একটি ছবিই চোখের সামনে ভাসে। বেশ গোলগালমতো শরীর, উচ্চতায় কিছু খর্ব বলে তা আরো বেশি গোলাকার লাগে, আড়ালে কেউ কেউ ময়েজ ভুঁড়ি বলে থাকে, লুঙ্গিটি হাঁটু পর্যন্ত উঁচু করে পরা, খালি গা – খুরপি হাতে নিড়ানি দিচ্ছেন অথবা মাচা মেরামত করছেন। তাঁর একটিমাত্র পুত্র, তখন তার বয়স একুশ-বাইশ, নাম মনে নেই। ওই বাড়িতে কোনোদিন কোনো মহিলা বা মেয়েকে দেখেছি বলে মনে পড়ে না।

তখনকার বগুড়া শহরের এক প্রান্তে এই পাড়ার আধ-ভুতুড়ে অন্ধকারে ন'টা বাজলেই অনেক রাত। এরও কিছু পরে রাতের নৈঃশব্দ আরো গাঢ় হয়ে এলে একজন মানুষ 'হ্যায় আপনা তো দিল তো দিওয়ানা, না জানে কিসপে আয়েগা'-র সুরে শিস দিতে দিতে আমাদের বাড়ি পেরিয়ে যেতেন। কালাম ভাই। তখন তিনি বিশ-বাইশ বছরের যুবক, কী করতেন ঠিক জানি না। আমাদের দক্ষিণে দুই বাড়ি পরে বেশ বিরাট জায়গা নিয়ে তাঁদের বাড়ি। উঁচু করে দেওয়াল ঘেরা বাড়ির বাইরে ছোটোমতো একটি মাঠ। আমরা বলি কালাম ভাইদের মাঠ, এখানে আমরা বালক-বালিকারা খেলাধুলা করি। মাঠের উল্টোদিকে বিশাল একটি তেঁতুল গাছ, যার নামে এই জায়গার নাম তেঁতুলতলা।

শোনা যেতো তেঁতুলতলার ওই বিশাল ঝাঁকড়া গাছের মাথায় অশরীরীদের দেখা যায় চন্দ্রালোকিত রাতে। দিনের বেলায় ঝরে পড়ে ছোটো ছোটো শুকনো পাতা আর পাকা তেঁতুলে গাছতলাটি ভরে থাকে। গাছের ছায়ায় দাঁড়িয়ে ওপরে তাকিয়ে দেখা যায়, ফলবান গাছটির পাতা বাতাসে ঝিরঝির কাঁপে। তখন সেদিকে তাকিয়ে কে বলবে এই গাছে কোনো কোনো রাতে অশরীরীরা যাতায়াত করে!

তেঁতুলতলার গা ঘেঁষে পি টি স্কুলের আজিজ স্যারের একতলা বাড়ি। খুব রাগী বলে খ্যাতি আছে আজিজ স্যারের। অথচ গ্রীষ্মকালের অপরাহ্নে খালি গায়ে লুঙ্গি পরে বারান্দার একটি চেয়ারে বসে তাঁকে হাতপাখার বাতাস খেতে দেখলে সে কথা বিশ্বাস করার কোনো কারণ খুঁজে পাওয়া যেতো না। অবশ্য কথা তিনি কম বলেন, হাসতে দেখা আরো দুর্লভ ঘটনা। একদিন সাহস করে তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিলাম তেঁতুলতলার অশরীরীদের কথা। আজিজ স্যার গলা খুলে হাসেন। বলেন, হামি তা'লে এই গাছতলার বাসাত অ্যাদ্দিন আছি ক্যাঙ্কা কর্যো?

কালাম ভাইয়ের বাবা হাসান তালুকদার গম্ভীর ধরনের মানুষ। কালাম ভাইয়ের বয়োজ্যেষ্ঠ সৎ ভাইয়ের নাম বাবু। তিনি থাকেন মূল বাড়ির বাইরে একটি বিশাল ঘরে, ঘরটি সম্ভবত এককালে বৈঠকখানা ছিলো। বাবু ভাই খেলাপাগল, নাটকপাগল মানুষ। পাড়ার নাটকের মহড়া হয় তাঁর

ঘরে। নাটক হতো সংলগ্ন মাঠে, যা আমাদের খেলার মাঠ। বাবু ভাইয়ের ঘরটি তখন গ্রীনরুমে রূপান্তরিত হয়।

মূল বাড়ির ভেতরে কী উপলক্ষে যেন একবার যাওয়ার সুযোগ হয়েছিলো। বাইরে থেকে বোঝার উপায় নেই, ভেতরে গাছপালা ঘেরা বিশাল বাড়ি, পেছনে একটি পুকুর। কালাম ভাইয়ের ছোটো আরেক ভাই ছিলেন, নাম সম্ভবত ছিলো নয়া, স্থানীয় উচ্চারণে লয়া ডাকা হতো। সুন্দর ফর্সামতো দেখতে ছিলেন, শোনা যায় যুবক বয়সে তাঁর খৎনা করানো হয়েছিলো। তাঁদের তিন ভাইয়ের চেহারায় বস্তুত কোনো মিলই ছিলো না। বাবু ভাইয়ের মুখ ও শারীরিক গঠন অনেকটা তাঁর বাবার মতো। কালাম ভাই মাঝারি স্বাস্থ্যের, শ্যামলা রং, মুখে বসন্তের দাগ তাকে কালোর দিকে ঠেলে দিয়েছে। চোখ সামন্য ট্যারা।

দিনের বেলায় কালাম ভাই গান গাইতেন না, শিসও দিতেন না। কোনোদিকে না তাকিয়ে চুপচাপ নিজের মতো হেঁটে চলে যেতেন। রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছেন, আমার কাছে এই কালাম ভাইয়ের ছবি। সেই সময় আর কোনোভাবে কোথাও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তাঁর হাঁটার ধরণটি বিশিষ্ট ছিলো। একেকটা ধাপ সামনে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে পেছনের পায়ের গোড়ালিটি কেমন উঁচু হয়ে সামান্য লাফিয়ে ওঠে, মনে হয় যেন নাচতে নাচতে যাচ্ছেন। মানুষটি শান্তশিষ্ট, কারো সাতে-পাঁচে নেই। তাঁর ওই হাঁটার ভঙ্গিটি এবং গভীর রাতের শিস তাঁকে বিশিষ্ট করেছিলো আমার বাল্যকালে।

আঠারো-ঊনিশ বছরের ব্যবধানে কালাম ভাইয়ের সঙ্গে একবার দেখা হয়েছিলো। ঠিক দেখা হওয়া বলা চলে না বোধহয়। তিনিও আমাকে দেখেছিলেন নিশ্চিত, কিন্তু হয় চিনতে পারেননি অথবা চিনতে চাননি। শান্তাহার থেকে বগুড়ার বাসে উঠেছি। সেই বাসের চালক কালাম ভাই। আমার ছেলেবেলার চেনা কালাম ভাইকে এভাবে দেখতে চাইনি। তিনি যদি আমাকে না চিনে থাকেন, অথবা চিনতে না চেয়ে থাকেন, তাতে কোনো অন্যায় হয়নি।

আমাদের পাড়ায় একটি ক্লাব ছিলো – ফোর এইচ ক্লাব। হেড, হার্ট, হ্যান্ড অ্যান্ড অনেস্টি – এই চার এইচ মিলিয়ে ফোর এইচ ক্লাব। তখন জানতাম না, অনেক বছর পরে জেনেছি ফোর এইচ নামের একটি সামাজিক আন্দোলনের সূচনা আমেরিকায় বিশ শতকের শুরুর দিকে। ক্রমে তা পৃথিবীর অনেক দেশে বিস্তৃতি পায়। বগুড়ার মতো ছোটো শহরে কী উপায়ে কার উদ্যোগে ফোর এইচ ক্লাব প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো জানা নেই। তেঁতুলতলার সামান্য দক্ষিণে একটি চৌরাস্তার মোড়ে টিনের চালওয়ালা একটি অপরিসর মাটির ঘরই ক্লাবঘর। বারান্দায় সারা দিনমান ক্যারমবোর্ড খেলা হয়।

স্থানীয় ফুটবল লীগে খেলে আমাদের ক্লাব, তেমন ভালো কিছু করেনি কখনো। তবে খেলার দিন বিকেলে ক্লাবঘর থেকে জার্সি-বুট পরা খেলোয়াড়রা পায়ে হেঁটে মাইল দেড়েক দূরের আলতাফুননেসা মাঠের দিকে রওনা হলে পাড়ায় সাড়া পড়ে যায়। আমাদের বয়সী পাড়ার ছেলেরা তাদের সঙ্গে সঙ্গে হাঁটি। রিকশাপ্রতি চার বা ছ'আনা পয়সার সংস্থান করা সম্ভব হলে রিকশায় চাপিয়ে দেওয়া হতো খেলোয়াড়দের, তখন আমরা রিকশার পেছনে দৌড়াই।

রিকশার পেছনে দৌড়ানোর আরো উপলক্ষ পাওয়া যেতো। প্রতি শুক্রবার নতুন ছবি আসে শহরের দুই সিনেমা হল উত্তরা ও মেরিনায়। রিকশায় বাদ্য বাজিয়ে শহরের সব অলিগলিতে সেইসব ছবির লিফলেট ছুঁড়ে দেওয়া হয়। আমাদের এলাকায় লিফলেট ছড়ানো রিকশার বাদ্য শুনলে আমরা ছুটতে থাকি। নায়ক-নায়িকার সাদা-কালো ছবি সম্বলিত একটা লিফলেট হস্তগত করা গেলে মানবজন্ম সার্থক হয়ে যায়। আরেক ধরনের প্রচার হয় রিকশা ও মাইক্রোফোনে ঘোষণা সহযোগে। ফুটবল লীগের সেরা ক্লাবগুলির খেলার দিন প্রচার করা হয়। মাইক্রোফোনে ঘোষণা: হৈ হৈ কাণ্ড রৈ রৈ ব্যাপার, অদ্য বিকাল পাঁচ ঘটিকায় আলতাফুননেসা খেলার মাঠে বাঘে-সিংহে লড়াই...। বাঘ-সিংহ বলতে বগুড়ার তখনকার অভিজাত দুই দল সিঅ্যান্ডবি (কনস্ট্রাকশন অ্যান্ড বিল্ডিং, কেউ কেউ বলতো চোর অ্যান্ড বাটপাড়) এবং হোয়াইট ক্লাব। সিঅ্যান্ডবি পরে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস ক্লাব বা ইউএফসি-তে রূপান্তরিত হয়। হোয়াইট ক্লাবে তখন খেলেন পরবর্তীকালে বাংলাদেশের ফুটবল ইতিহাসে মধ্যমাঠের অন্যতম সেরা খেলোয়াড় অমলেশ সেন। সিঅ্যান্ডবি-র হয়ে একবার এক দীর্ঘদেহী তরুণ গোলকীপার খেলতে এলেন রংপুর থেকে, এই প্রথম বাঁ-হাতি গোলকীপার দেখলাম। নাম শাণ্টু, পরে জাতীয় দলের অপরিহার্য গোলকীপার ছিলেন দীর্ঘকাল।

ফোর এইচ ক্লাবের আরো কিছু ক্রিয়াকাণ্ড ছিলো। বছর বছর ক্যারম টুর্নামেন্ট হতো ক্লাবঘরের বারান্দায়। শীতকালের সন্ধ্যায় আলো জ্বালিয়ে ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট কালাম ভাইদের মাঠে। এইসব টুর্নামেন্টে শহরের সব পাড়া থেকে সেরা ক্যারম ও ব্যাডমিন্টনবিদদের খেলা দেখার সুযোগ হতো।

বছরে একটি করে নাটক মঞ্চস্থ হতো, আবৃত্তি ও গান সহযোগে রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী। নাটকের রিহার্সাল হয় বাবু ভাইয়ের ঘরটিতে দরজা বন্ধ করে। ছোটোদের সেখানে প্রবেশ করার অধিকার নেই, আমরা ভিড় করি পেছনদিকে ঘরের একমাত্র জানালাটিতে। সেখানেও তাড়া খেতে হয়, বিশেষ করে নায়ক-নায়িকার মধ্যে ভালোবাসাবাসির কথা হচ্ছে। ছোটোদের সেসব শোনা উচিত নয়। নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার সময় অবশ্য এইসব বিধিনিষেধের কথা কেউ মনে রাখতো না, তা সব

বয়সীদের জন্যে উন্মুক্ত। তখনকার দিনে পাড়ার নাটক মানেই নাট্যকারের নাম অবধারিতভাবে কল্যাণ মিত্র। বৌদির বিয়ে, শেষ প্রহর - এইরকম দুয়েকটা নাম মনে পড়ে।

আমার সেই সময়ের আরেক হিরো পাড়ার খোকা ভাই, পোশাকী নাম আবদুর রহমান। তাঁর কনিষ্ঠ সহোদর ফটু এবং মামাতো বা ফুপাতো ভাই মটু আমার সমবয়সী, সে বাড়িতে আমার যাতায়াত অবাধ। খোকা ভাই থাকতেন বাড়ির বাইরের দিকের একটি ঘরে। ফোর এইচ ক্লাবের ফুটবল ছাড়া আর সবকিছুতে প্রধান সংগঠক খোকা ভাই। ক্যারমে তিনি বগুড়া শহরের রানার আপ, চ্যাম্পিয়ন বাদুড়তলার মিন্টু। খোকা ভাই ব্যাডমিন্টনও খেলতেন অসাধারণ। এই দুটি খেলায় আমার কাছে সত্যিকারের চ্যাম্পিয়ন তিনিই, তাঁর খেলা যেন অপরূপ শিল্পের কারুকাজ-খচিত। ইংরেজিতে হয়তো স্টাইলিশ শব্দটি ব্যবহার করা চলে। ব্যাডমিন্টনে আমাদের শহরের দীর্ঘকালের চ্যাম্পিয়ন আইনুলের খেলাও আমার কাছে ততো চমকপ্রদ লাগতো না, যতোটা লাগতো খোকা ভাইয়ের প্রায়-নৃত্যপর মনোহর একেকটি মুভমেন্ট। আজও চোখে লেগে আছে সেইসব।

তিনি যা করেন, তাতে থাকে একটু সৌন্দর্যবোধের স্পর্শ। পোশাকে-আশাকে পরিপাটি, ব্যাকব্রাশ করা নিপাট চুল, ভাসা ভাসা চোখ দুটি মায়াবী। রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তীতে আবৃত্তি করেন, নাটক হলে নায়কের ভূমিকা বাঁধা। আযিযুল হক কলেজের ছাত্র তিনি, পড়াশোনায় খুব মেধাবী ছিলেন বলে শুনিনি। কিন্তু আমার হিরো হওয়ার জন্যে তা কোনো বাধা হয়নি।

একবার ঠিক হলো, ক্লাবের দেওয়াল পত্রিকা হবে। নাম ঠিক হয়েছে কাকলি। সম্পাদক খোকা ভাই সাদা পোস্টার বোর্ডে নিজের হাতে লিখলেন, অলংকরণ করলেন। আমার একটি রচনা সেখানে অন্তর্ভুক্ত হয়েছিলো। উল্লেখ করার মতো কিছু তো নয়ই, মৌলিক রচনাও নয়। আসলে ছিলো বইয়ে পড়া বা মুখে শোনা কিছু ব্যঙ্গ-কৌতুকের সংকলন। ভাষাটি নিজের এই যা। অবশ্য তা কতোটা নিজের, কতোখানি টুকে নেওয়া বা ধার করা, এতোকাল পরে তা আর জানার উপায় নেই, কিন্তু আশংকাটি উল্লিখিত হওয়া দরকার। রচনাটি নয়, আসল কথা সেই প্রথম আমার প্রকাশিত হওয়ার বাসনাটি প্রকাশিত হলো। এক অর্থে খোকা ভাই আমার প্রথম সম্পাদক।

কালাম ভাইদের মাঠে, যেখানে নাটক মঞ্চস্থ হয়, রবীন্দ্র-নজরুল জয়ন্তী হয়, ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট হয় – যা ওই ক'টি দিন বাদে মূলত সারাবছর আমাদের দখলে থাকে। বালিকারা এক কোণে জায়গা করে নিয়ে এক্কা-দোক্কা খেলে। আমরা বালকরা ফুটবল-ক্রিকেট খেলি। বল কিন্তু একই – টেনিস বল। দুটো আধলা ইট দুই দিকে বসিয়ে গোলপোস্ট, গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে খেলা হয়।

বৃষ্টিতে ভিজে খেলার সেই হর্ষ-আনন্দ আর কীসে আছে? বৃষ্টির পানিতে ঘাসের ওপর পানি জমে গেছে, বল আটকে যায়। সেই বলের দখল নিতে হুড়োহুড়ি, হয়তো বল ছেড়ে জমে থাকা পানিতেই পা চালাচ্ছি, ছিটকে আসা পানি সামনে কিছু দেখতে দিচ্ছে না। পা পিছলে পড়ে গেলেও হাসি পায়, ব্যথাবোধ বলে পৃথিবীতে তখন কিছু আছে কিনা কে খবর নেয়! ক্রিকেট খেলা হয় শীতকালে। কয়েকটা ইট পরপর সাজিয়ে স্টাম্পের কাজ দিব্যি চলে যায়। টেনিস বলে ফুটবল খেললে তার নাম বল খেলা, ক্রিকেট-সদৃশ হলে ব্যাটবল।

সত্যিকারের ফুটবল আমরা ব্যবহার করতে শুরু করেছিলাম ক্লাস ফাইভ-সিক্সে পড়ার সময়। তখন অবশ্য আমরা আর কালাম ভাইদের মাঠে খেলি না। বড়ো হয়ে গেছি যে! খেলতে যাওয়া হয় পাড়া ছেড়ে সামান্য কিছুদূরে। শেরপুর রোড ঘেঁষে মোহাম্মদ আলী হাসপাতালের ঠিক উত্তরে অল্প উঁচু দেওয়ালঘেরা একটি মাঠ ফাঁকা পড়ে থাকতো। সবাই মেডিক্যালের মাঠ বলতো। এখন সম্ভবত সেখানে মেডিক্যাল কলেজ। খেলোয়াড়রা সবাই মিলে চাঁদা তুলে ফুটবল কিনে আনা হতো। সবার সামর্থ্য সমান নয় বলে চাঁদায় সামান্য কমবেশি হতো, তাতে অবশ্য কিছু এসে যায় না। খেলা নিয়ে কথা, আর সব গৌণ সেখানে। আমরা যে ফুটবল কিনতাম, আজকের ফুটবলের সঙ্গে তার ফারাক অনেক। পুরু চামড়ার খোলসে একটি চেরামতো জায়গা থাকতো। তার ভেতর দিয়ে রাবারের ব্লাডার ঢুকিয়ে পাম্প করে বল ফোলানো হতো। পরিমাণমতো বাতাস ঢোকানো হলে ব্লাডারের মুখটি শক্ত করে বাঁধো, তারপর বস্তুটি সজোরে চেপে রেখে জুতার ফিতা বাঁধার কায়দায় খোলসের চেরা জায়গাটি চেপে বাঁধো। তারপরেও বলটি সম্পূর্ণ গোলাকার করা যেতো না। আরো মুশকিল, আমরা খেলি খালি পায়ে, ফিতা বাঁধা জায়গাটি পায়ে লাগলে ব্যথা করতো খুব। তারপরেও তৃপ্তি, ফুটবল খেলছি।

কালাম ভাইদের মাঠে খেলার সঙ্গী ফটু, মটু, নবাব (আমরা লবাব ডাকতাম), আনোয়ার, হস্তালি (আসল নাম হযরত আলী), খালেক। খালেকের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা কিছু বেশি ছিলো। একদিন বল খেলা হচ্ছে। আমার পা থেকে বল কেড়ে নিতে ব্যর্থ হয়ে খালেক কনুই দিয়ে পাঁজরে ধাক্কা দেয়। নিমেষে মাথায় রক্ত উঠে আসে, খালেকের শার্টের কলার ধরে ঘুষি বাগিয়ে তুলি। নাক বরাবর বসিয়ে দেবো, এইসময় হঠাৎ মনে হয়, ঘুষিটা দেওয়ামাত্র খালেকের নাকমুখ রক্তাক্ত হয়ে যাবে। দৃশ্যটি চোখের সামনে স্পষ্ট দেখতে পাই। বন্ধুকে কেমন করে মারবো? তার নাক ফেটে রক্ত বেরিয়ে আসছে, দেখবো কী করে? মুহূর্তে স্থির হয়ে যাই, শূন্যে ঝুলে থাকে আমার উদ্যত মুষ্টি। খালেক অবশ্য থেমে থাকেনি, এলোপাথাড়ি গোটাকয়েক ঘুষি পড়েছিলো আমার চোয়ালে। টের পাই, সবাই খেলা থামিয়ে মারামারি দেখছে। আমি মার খাচ্ছি, হেরে যাচ্ছি। অথচ শূন্যে

তোলা পাকানো হাতের মুঠি কিছুতেই নামিয়ে আনতে পারি না খালেকের মুখে। তার সঙ্গে বন্ধুত্বের সেখানেই সমাপ্তি, আর কোনোদিন একটি কথাও আর হয়নি।

হস্তালির সঙ্গে এক বিচিত্র অবস্থায় দেখা হয় বারো-তেরো বছর পর। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি। ছুটিতে বগুড়া গেছি। পুরনো পাড়ায় কিছুক্ষণ হাঁটলাম এক বিকেলে। একটা খালি রিকশা পেয় উঠে বসি। গন্তব্য জানাই, সাতমাথা। রিকশা চলতে শুরু করলে অকস্মাৎ চালকের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, আরে এটা হস্তালি না! ভালো করে দেখি, ঠিক তাই। সে আমাকে কিছু বলেনি, চিনেছে কি না তা-ও বোঝার উপায় নেই, একমনে রিকশার প্যাডল ঘোরায় সে। আমার অস্বস্তি হয়, বিচিত্র এক অপরাধবোধ আমাকে পেয়ে বসে। আমার বাল্যকালের বন্ধু রিকশাচালক, সেখানে আমার কোনো ভূমিকা নেই। কিন্তু সে চালক এবং আমি আরোহী, এইটুকুই সহ্য করতে পারছিলাম না। গন্তব্যে অনেক আগেই আমি হঠাৎ রিকশা থামাতে বলি এবং দ্রুত একটি পাঁচ টাকার নোট বাড়িয়ে দিয়ে মুখ ফিরিয়ে উল্টোদিকে হাঁটতে থাকি। হস্তালি যদি আমাকে না চিনে থাকে, আমার মুখ তাকে দেখানোর দরকারই নেই।

তস্করবৃত্তির জন্যে শহরে খ্যাতি ছিলো আমাদের পাড়ার তোতা ভাইয়ের, যদিও পাড়ায় নাকি কখনো তা করতেন না। প্রচলিত ধারণা এইরকম যে নেহাত ছিঁচকে না হলে অপরাধীরা নিজের এলাকায় অপরাধগুলি করে না, করে অন্যত্র। হয়তো তোতা ভাইয়ের ক্ষেত্রেও তা সত্যি। একটা সময় ছিলো শুনেছি যখন শহরে কোথাও চুরির ঘটনা ঘটলে সকালে পুলিশ তোতা ভাইকে ধরে নিয়ে যেতো। বিকেলে আবার তিনি ফিরেও আসতেন দিব্যি। মুখ চিনতাম, সাইকেলে চড়ে আমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে যাওয়া-আসা করতেন, তাঁকে জানলাম একটু বড়ো হয়ে ফোর এইচ ক্লাবে ক্যারম খেলতে গিয়ে। সেই সময় তিনি বগুড়ার ভাণ্ডারী গ্লাস ফ্যাক্টরিতে রাতের শিফটে কাজ করেন। দুপুরের দিকে আসতেন ক্লাবে। বাঁ-হাতি তোতা ভাই খুব ভালো খেলতেন না, তবে তাঁর উদ্দীপনা আর কেউ ভালো খেললে সে বিষয়ে অকৃত্রিম উচ্ছ্বাস ছিলো দেখার মতো। এই তোতা ভাইকে তাঁর সম্পর্কে প্রচারিত গল্পের সঙ্গে মেলানো যায় না। এইসময় তিনি নির্ভেজাল আমোদপিয়াসী একজন মানুষ। ক্লাবঘরের খুব কাছেই তাঁর বাড়ি, তাঁর ছোট্টো মেয়েটি মাঝেমধ্যে দৌড়ে আসে বাবার কাছে নানান বায়না নিয়ে। তখন খেলা থামিয়ে তিনি বিশুদ্ধ স্নেহময় পিতা।

ক্যারমবোর্ডে ব্যবহার্য বোরিক পাউডার আসতো তোতা ভাইয়ের ঘর থেকে। গ্লাস ফ্যাক্টরিতে নাকি এই পাউডারের ব্যাপক ব্যবহার। তার কিছু তাঁর হাত ধরে চলে আসে, বড়ো বড়ো চাঁই আকারে। সেগুলো ভেঙে বিক্রি করতেন তিনি ফোর এইচ ক্লাবের ক্যারম খেলোয়াড়দের কাছে।

দোকান থেকে কেনা বোরিকের তুলনায় এই পাউডারের মান অনেক ভালো ও বিশুদ্ধ, পরিমাণেও অনেক পাওয়া যায়। দুই আনার বোরিকে সারাদিন খেলা যায়।

একদিন এক বিশাল কলরবে পাড়া জাগ্রত হয়। পাড়াময় রটে যায়, ময়না খুন হয়েছে। ময়না কে? সে এই পাড়ারই এক নবীন যুবক, তোতা ভাইয়ের ছোটো ভাই। ঘটনাস্থল ঠনঠনিয়া মসজিদের পেছনে মানুষ গিজগিজ করে। তার ফাঁক দিয়ে নিজের অকিঞ্চৎকর শরীরটি গলিয়ে দিই। সামনে এসে দেখি, প্রায় পত্রশূন্য একটি বৃক্ষের তলায় চিৎ হয়ে পড়ে থাকা একটি শরীর। এই তাহলে ময়না। আগে কখনো দেখেছি বলে মনে পড়ে না। কালচে রক্ত জমাট বেঁধে আছে বুকের ওপর। আমার বোঝার কথা নয়, বলাবলি শুনে বুঝি ছুরিকাঘাতে খুন করা হয়েছে তাকে। শরীরটি ঠিক শায়িত নয়, দুই পা পেছনের দিকে মোড়ানো। যেন সেজদায় বসে সামনে উবু না হয়ে পেছনে শরীর চিতিয়ে বুকে ছুরি নিয়েছে, শুধু ছুরিটি এখন উধাও। ঝাঁকড়া চুলে ভরা মাথাটি একপাশে ফেরানো, চেখ দুটি খোলা। যেন কিছু বলে উঠবে এখনি। ভালো করে দেখলে বোঝা যায় তা প্রকৃতপক্ষে মৃত মাছের চোখের মতো স্থির ও ভাবলেশশূন্য। পাথরের চোখ বলেও ভ্রম হতে পারে।

বিস্ময় লাগে, এইভাবে মানুষ খুন হয়? এর আগে কোনো মৃতদেহ দেখিনি। আজও দেখা হতো না যদি এই ভিড়ে মিশে আসা বাড়ির কারো জ্ঞাতসারে ঘটতো। এক পাড়ায় বাস করেও ময়নাকে আগে কখনো দেখিনি। গাছতলায় হাঁটু মুড়ে পড়ে থাকা নিস্পন্দ প্রাণহীন ময়নাকে কোনোকালে ভুলে যাওয়া হয়নি। এটি সেই সময়ের কথা যখন আমোদপ্রিয় তোতা ভাইয়ের সঙ্গে আমার দেখাশোনা ঘটেনি।

একাত্তরে রোজার সময় সেহরি খেয়ে ভোরের নামাজ-পূর্ব ঘুমে মগ্ন আমাদের পাড়াটি ঘেরাও করে পাকিস্তানী সেনারা। সঙ্গে পাড়ার দুই রাজাকার – আনিসার ও তার যুবাবয়সী পুত্র। সেই ভোরে বেছে বেছে পাড়ার যুবকদের তুলে নেওয়া হয়। ধৃত চোদ্দোজনের মধ্যে একজন মাত্র মহিলা, তিনি তোতা ভাইয়ের স্ত্রী, ফোর এইচ ক্লাবে যাওয়া-আসার কালে দুয়েকবার তাঁদের বাড়ির দরজায় দেখেছি। ঠিক কোন অপরাধে তাঁকে ধরা হয়েছিলো কেউ জানে না। এদের সবাইকে দূরবর্তী এক গ্রামের পুকুরপাড়ে গুলি করে মারা হয়।

তোতা ভাইয়ের নিজের পরিণতিও প্রায় কাছাকাছি, যদিও তা বিদেশী দখলদার সেনাদের হাতে ঘটেনি। তা ঘটেছিলো স্বাধীনতার বছর আড়াই পরে। তখন বগুড়া শহর শাসিত হচ্ছে খসরু-রানা-শাহেদ নামের যুবলীগের তিন স্বেচ্ছাচারীর হাতে, তারাই শহরের যে কারো দণ্ডমুণ্ডের

মালিক তখন। যতোদূর শোনা যায়, রানার দলবল একদিন তোতা ভাইকে তুলে নিয়ে যায়, যা রাজনীতিসংশ্লিষ্ট বলে ধারণা করার কোনো উপায়ই নেই।
তোতা ভাই আর কোনোদিন ফেরেননি।

ইগলু-র ঠাণ্ডা দোকানে বসে আইসক্রীম খাওয়ার কথা অবশ্য মনে আছে।
আইসক্রীমের যে দোকান হয়, তা-ই জানতাম না কখনো।

আমাদের বগুড়া শহরে বাক্স-সদৃশ বহনযোগ্য ফ্লাস্কে পাড়ায় পাড়ায়,
স্কুলের গেটে বিক্রি হয় রুবেল ও শাহীন নামক দুই প্রকারের আইসক্রীম।
দাম দুই পয়সা, এক আনা ও দুই আনা।

ঢাকা শহরে

বগুড়া শহরের হৃৎপিণ্ড সাতমাথার মোড় ছাড়িয়ে অনেক উত্তরে বড়োগোলা-দত্তবাড়ি-কাটনারপাড়া-শিববাটি-কালিতলা পেরিয়ে বগুড়া কটন মিল, যেটি তখনকার পূর্ব পাকিস্তানের একমাত্র প্রতিষ্ঠান যা কম্বল প্রস্তুত করে। কটন মিলেরও পরে সুবিলের সেতু পার হলে একটি মাঠসহ আযিযুল হক কলেজের একতলা ভবন। সুবিল সেতুর সঙ্গে লাগানো মহিলা কলেজটি তখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আযিযুল হক কলেজের এই মাঠে বছর বছর শীতকালের দুপুরে অ্যানুয়াল স্পোর্টস হয়, আব্বার সঙ্গে যাই প্রতি বছর। পরে কলেজের সম্প্রসারণ হয়, নতুন একটি দোতলা ভবন ওঠে বগুড়া রেলস্টেশনের পশ্চিমে, সম্ভবত ষাটের দশকের শেষদিকে সরকারি হওয়ার পরের ঘটনা। কলেজের নতুন ও পুরনো দুই ভবনের মধ্যে দূরত্ব কয়েক মাইলের। বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগ থাকে, নতুনটি কলা বিভাগের জন্যে।

আব্বা আযিযুল হক কলেজে অধ্যাপনা শুরু করেছিলেন ৫৮ সালে। কলেজটি তাঁর পূর্বপরিচিত, এখানে তিনি নিজে ছাত্র ছিলেন একদা। জয়পুরহাটের খঞ্জনপুর হাইস্কুল পাশ করার পর এসেছিলেন, তখন ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামের দুটি রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হচ্ছে। আব্বার কর্মস্থলটি আমাদের তেঁতুলতলার বাড়ি থেকে মাইল পাঁচ-ছয়েকের দূরত্বে। একটি সবুজ ড্যালে সাইকেলে তিনি যাতায়াত করেন। একদিন আব্বা ঘোষণা দিলেন, তিনি মোটর সাইকেল কিনবেন। তখন আমি ক্লাস ফোরে। এই বস্তু সবে বগুড়া শহরে দুয়েকটি এসেছে, কোনো বিক্রেতা প্রতিষ্ঠান নেই তখনো। কিনতে হলে ঢাকা যেতে হবে।

আব্বার সঙ্গী হই ঝর্ণা ও আমি। সেই সময় ঢাকা-বগুড়া সড়ক যোগাযোগ দুর্গম, কোচ সার্ভিস তখনো চালু হয়নি। ফলে দীর্ঘ ট্রেন-যাত্রা। বগুড়া থেকে বোনারপাড়া হয়ে ফুলছড়ি ঘাট। স্টীমারে চড়ে 'কুল নাই কিনার নাই' যমুনা নদী পার হয়ে ওপারে বাহাদুরাবাদ ঘাট। আবার

ট্রেন। এই জায়গাগুলির নাম ছাড়া সেই ট্রেনযাত্রার কিছুই স্মরণে নেই। তখন কমলাপুর স্টেশন তৈরি হয়নি, ঢাকা স্টেশন বলতে কুর্মিটোলা অথবা গুলিস্তান এলাকার ফুলবাড়ি।

ফুলবাড়ি স্টেশনে আমাদের নিতে এসেছেন, যতোদূর মনে পড়ে, দুলাল ভাই। নিজে গাড়ি চালিয়ে এসেছেন। মফস্বল শহরের এক অর্বাচীন বালক আমি, ঢাকা শহরে গাড়ি চালান দুলাল ভাই, সে এক বিষম বিস্ময়ের কথা। তাঁর মা, আমাদের মাজেদা খালাম্মা, আম্মার ফুপাতো বোন। লতিফ খালু ঢাকায় ব্যবসায়ী। ছোটোখাটো মাজেদা খালাম্মা দুর্দান্ত সুন্দরী। খালুও অত্যন্ত সুপুরুষ, গায়ের রং দেখে ঠিক বাঙালি বলে মনে হয় না।

খালুর ঠিক কী ব্যবসা, আমরা জানি না। তবে শুনতাম মাঝেমধ্যে তাঁদের প্রাচুর্যের সীমা-পরিসীমা থাকতো না, আবার কখনো বাড়িভাড়া বাকি বাজার হয় না অবস্থা। একসময় কিছুকালের জন্যে লতিফ খালু চলচ্চিত্র ব্যবসায় জড়িত হয়েছিলেন। ষাটের দশকে তাঁর প্রযোজনায় একটিমাত্র উর্দু ছবি নির্মিত হয়েছিলো – ইয়ে ভি এক কাহানী। পরিচালক ছিলেন সম্ভবত এস এম শফি, নায়ক ছিলেন এখনকার হারুণ ডায়রিখ্যাত হারুণ। নায়িকা বোধহয় চিত্রা। ছবিটি মোটেই ব্যবসা করেনি, খালু প্রচুর লোকসানে পড়েছিলেন অনুমান করি। আর সে পথ মাড়াননি তিনি।

তাঁদের ছেলেমেয়ে তখন সাতজন – দুলাল-স্বপন-তপন-রীনা-পুতুল-রতন-কিরণ। আরো অনেক পরে আসে বাবু। প্রত্যেকেই দেখতে সুন্দর। প্রথম তিনজন আমার চেয়ে বেশ বড়ো। রীনা-পুতুল ঝর্ণার চেয়ে কিছু ছোটো। রতন-কিরণ একবারে কোলের শিশু। মাজেদা খালাম্মাদের বাসা উয়ারির হেয়ার স্ট্রীটে। দুলাল ভাই তখন একটি মোটর সাইকেলের মালিক – ভেসপা। স্বপন ভাইয়ের আছে হোন্ডা। স্পষ্ট মনে আছে আমাদের উপস্থিতিতেই তপন ভাইও খালুর কাছে একটি হোন্ডার দাবি পেশ করলেন এবং খালু তৎক্ষণাৎ সম্মত। অর্থাৎ, এই বাড়িতে তখন প্রাচুর্যের দিন চলছে।

সব মিলিয়ে বোধহয় দিন তিন-চারেক ঢাকায় থাকা হলো সে যাত্রায়। বিশেষ কোথাও যাওয়া হয়েছিলো কি না মনে পড়ে না। ইগলু-র ঠাণ্ডা দোকানে বসে আইসক্রীম খাওয়ার কথা অবশ্য মনে আছে। আইসক্রীমের যে দোকান হয়, তা-ই জানতাম না কখনো। আমাদের বগুড়া শহরে বাক্স-সদৃশ বহনযোগ্য ফ্লাস্কে পাড়ায় পাড়ায়, স্কুলের গেটে বিক্রি হয় রুবেল ও শাহীন নামক দুই প্রকারের আইসক্রীম। দাম দুই পয়সা, এক আনা ও দুই আনা। দুই আনা দামেরটিতে কিছু দুধের স্বাদ পাওয়া যায়, অন্যগুলি স্রেফ আইসক্রীমের আকারে বানানো রঙিন বরফ। তাতেই

চলে যায় আমাদের। ইগলুর মতো ঠাণ্ডা ঘরে চেয়ার-টেবিল সাজানো দোকান আমাদের ধারণায়ও ছিলো না। আর কী স্বাদ সেই আইসক্রীমের!

বাড়িতে রীনা-পুতুল আমাদের দুই ভাইবোনের সর্বক্ষণের খেলার সঙ্গী। তারা এক ধরনের সেমাই বানায়। মাখানো ময়দা তর্জনী ও বুড়ো আঙুলের মাঝখানে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ক্ষুদ্রাকৃতি পোকার মতো ছোটো সেমাই। জানা গেলো এই সেমাইকে বলে কুট্টি সেমাই। তখনো জানি না, পুরনো ঢাকার আদি বাসিন্দাদের কুট্টি বলা হয়। আমরাও এই সেমাই বানানো শিখলাম। বাড়িতে ফিরে আম্মাকে বানিয়ে দেখালাম। আম্মা রান্নাও করে দিলেন। ভালো লাগেনি একটুও।

আব্বা কিনলেন হোন্ডা ফিফটি। হালকা সবুজাভ রং। ফুলবাড়ি স্টেশনে তাকে ট্রেনে তুলে দেওয়া হলো। সন্ধ্যার ট্রেনে আমাদের তুলে দিতে এলেন লতিফ খালু। তাঁর সঙ্গে আর কখনো আমার দেখা হয়নি। একাত্তরে যুদ্ধের সময় সপরিবারে চলে গিয়েছিলেন গ্রামের বাড়ি নওগাঁর রানীনগরে। তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের হাতে নিহত হয়েছিলেন বলে শোনা যায়। ব্যক্তিগত শত্রুতার জের ধরে তাঁকে খুন করা হয়, এরকম জনশ্রুতিও ছিলো। তখন সেই যুদ্ধের ডামাডোলে এইসব যাচাই করার উপায় ছিলো না। মুসলিম লীগের সঙ্গে তাঁর সংশ্লিষ্টতা ছিলো শুনেছি, যদিও স্বাধীনতাবিরোধী কোনো তৎপরতার কথা শোনা যায়নি কখনো।

সেই স্বল্পকালীন ঢাকা ভ্রমণের সময় জানি না, কয়েকটি বছরের ব্যবধানে যৌবনের আশ্চর্য দিনগুলিতে এই শহর আমার কী প্রিয় হয়ে উঠবে।

আমার সাহস, দৃঢ়তা বা প্রতিভা কোনোটিই আমাকে রক্ষা করতে পারেনি।
চলনে-বলনে আমি নিজেকে বারবার বদলেছি,
নতুন জায়গা ও পরিবেশ আত্মস্থ করার চেষ্টা করেছি।

যদিও ভেতরের মানুষটি সেই আদি ও অকৃত্রিম তেঁতুলতলার মুকুল।

শিকড়ের গল্প : দোগাছি

অন্য কারো এই অভিজ্ঞতা আছে কি না জানা নেই, কিন্তু পারিবারিক সংস্কৃতি ও অনুশাসনের ফলে আমি নিজে অন্তত দুটি পৃথক ও আপাতবিরোধী দুটি ব্যক্তিত্বের পরিচর্যায় লিপ্ত হই খুব বাল্যকালেই। বাড়ির আমি এবং বাইরের আমি দুটি আলাদা বালক।

আমার বাল্যকালে সারা পূর্ব পাকিস্তানে, তখনো বাংলাদেশ হতে ঢের বাকি, একমাত্র বগুড়া জেলায় কোনো মহকুমা ছিলো না, এতোই ছোটো সে জেলা। পরে মহকুমার স্বীকৃতি পায় জয়পুরহাট, কালক্রমে জেলাও হয়। বৃহত্তর বগুড়া জেলায় অন্তত চার রকমের আঞ্চলিক ভাষা প্রচলিত। ক্ষেতলাল-জয়পুরহাট অঞ্চলের ভাষা রংপুরের কিছু অঞ্চলের সঙ্গে সামান্য মেলে। রাজশাহীর নওগাঁ-সংলগ্ন শান্তাহার-আদমদীঘি এলাকায় নওগাঁর প্রভাব। পুবে যমুনা-বাঙালি নদীর তীরবর্তী জনপদে আরেক ভাষা, আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *খোয়াবনামা*-য় তার নমুনা আছে। আর বগুড়া শহরের স্থানীয় ভাষা এগুলোর কোনোটির সঙ্গে মেলে না, সম্পূর্ণ আলাদা ধরনের আপাত-রুক্ষ এক ভাষা।

আমার দাদার বাড়ি জয়পুরহাট শহর থেকে মাইল চারেক পশ্চিমে, গ্রামের নাম দোগাছি। মায়ের বাপের বাড়ি নওগাঁ শহর থেকে বারো মাইল উত্তরে বড়ো কালিকাপুরে। ফলে আমাদের বাড়িতে বলা হয় এক অদ্ভুত খিচুড়ি ভাষা – তা না জয়পুরহাটের, না নওগাঁর, না শহর-বগুড়ার। জয়পুরহাট-নওগাঁর ভাষার সঙ্গে বইয়ের বাংলার কিছু মিশেল দিলে যে বস্তু হবে, আমাদের বাড়িতে সেই ভাষা বলা হয়।

প্রথম স্কুলে যেতে শুরু করে লক্ষ্য করি, বাড়ির ভাষায় কথা বললে সবাই কেমন চোখে যেন তাকায়। অন্যদের সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে নিজের কথাই কানে বেখাপ্পা লাগতে থাকে। পাড়ায় কালাম ভাইদের মাঠে খেলতে গেলেও একই অবস্থা। কিন্তু তখন বাড়ির ভাষা ছাড়া আর জানি

কেতাবী বাংলা। সেই ভাষায় কথা বলার অভ্যাস নেই, বললে আরো বেমানান হবে বুঝতে পারি। অগত্যা বগুড়া শহরের চালু ভাষা শিখে ফেলতে হয়, অল্পকালেই সিদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হয়। তেঁতুলতলায় মার্বেল খেলতে গিয়ে স্থানীয় ভাষায় অনায়াসে তখন বলতে পারি, হরে গড়ে লড়ে চড়ে, পোটক্যা গেলে সই। স্কুলে বলি, ইংক্যা করিচ্ছু ক্যা? কী দেখিচ্ছু?

আব্বা-আম্মা আমাকে এই চণ্ডভাষা বলতে শুনলে অজ্ঞান হয়ে যেতে পারেন। বাড়ি ফিরে আবার সেই খিচুড়ি ভাষা। তখন কি জানি, পরবর্তীকালে ঢাকায় আরেকটি সম্পূর্ণ নতুন কথ্য ভাষা আমাকে আত্মস্থ করতে হবে? কেউ কেউ ঘরে বলা ভাষাটি চিরকাল সর্বত্র চলমান রাখতে পারে, আমাদের ফারুখ ফয়সল যেমন পেরেছে। আমার সাহস, দৃঢ়তা বা প্রতিভা কোনোটিই আমাকে রক্ষা করতে পারেনি। চলনে-বলনে আমি নিজেকে বারবার বদলেছি, নতুন জায়গা ও পরিবেশ আত্মস্থ করার চেষ্টা করেছি। যদিও ভেতরের মানুষটি সেই আদি ও অকৃত্রিম তেঁতুলতলার মুকুল।
+
পিতামহের গ্রাম দোগাছির খুব কাছাকাছি কোনো নদী নেই, আখের ক্ষেত চারদিকে। এ অঞ্চলের মানুষ আখ বলে না, বলে কুশার। কোন সুদূর এক শীতভোরের সুগন্ধ এখনো কোথা থেকে ভেসে আসে। কুয়াশাময় তীব্র শীতের প্রত্যুষে খোলা মাঠের মাঝখানে অনুচ্চ খুঁটিতে আড়াআড়ি বাঁশে ঘেরা একটি জায়গায় চুলায় আগুন জ্বলে। খড়ের আগুনে কুশারের গুড় জ্বাল হচ্ছে। আগুনের চারপাশ ঘিরে বসা কয়েকজন মানুষ, তাদের মধ্যে আমার পিতামহকে কি দেখা যায়? মনে পড়ে না। আখগুড়ের সুগন্ধে ম ম করে চরাচর।

তখন আমার অনতিবালক বয়স। জয়পুরহাটে তখনো চিনিকল বসেনি। চিনিকলটি স্থাপিত হওয়ার পর এ অঞ্চলের সমস্ত গ্রামে আখের গুড় তৈরি নিষিদ্ধ হয়ে যায়, আইন করে বলা হয় সব কুশার বিক্রি করতে হবে চিনিকলের কাছে তাদের নির্ধারিত দামে। গুড় তৈরির সুগন্ধ লুকিয়ে রাখা যায় না বলে গোপনেও তা করা সম্ভব হয় না। জীবনভর গুড়ের স্বাদে অভ্যস্ত গুড়প্রিয় মানুষ তখন হুতাশ করে, আমার পিতামহও এই দলের অন্তর্ভুক্ত। গুড়ের সেই স্বাদ চিনিতে নেই, তবু উপায় কি! মানুষ মুখ বদলাতে বাধ্য হয়। নিজের জমিতে ঘাম ঝরিয়ে কুশারের চাষ হবে, তা দিয়ে আমি কী করবো তা-ও রাষ্ট্র নির্দেশ করে দেবে। আজ মনে হয়, মানুষের জীবন হয়তো এইভাবে বদলে যেতে থাকে। আমার বালক-মস্তিষ্কে তখনো এইসব বোধ জন্মায়নি। মাঘ মাসের সেই শীতভোরের সুগন্ধ এখন দূরস্মৃতির বেশি কিছু আর নয়। পিতামহ বিগত কতোকাল আগে, আগুনের চারপাশ ঘিরে বসে আছে কয়েকজন মানুষ গুড় তৈরির অনুশীলন ও অপেক্ষায় – এই ছবিটি অটুট।

পিতামহের পাঁচ পুত্র ও দুই কন্যার মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ আমার পিতা। চাষবাস-নির্ভর এই গ্রামীণ পরিবারে লেখাপড়ার কিছু চর্চা ছিলো। দাদা নিজে প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা বেশি করেছিলেন বলে মনে হয় না। বস্তুত, আমার পিতামহের বেড়ে ওঠার সেই সময়ে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা দোগাছি গ্রামে খুব একটা সম্ভব ছিলো বলে মনে হয় না। তবু লেখাপড়া তিনি কিছু জানতেন, পড়তেন প্রচুর ও অবিরাম। বিদ্যাশিক্ষায় নাতি-নাতনিদের ক্রমাগত উৎসাহিত করতেন, তাগাদা দিতেন। তাঁর পুত্ররা প্রত্যেকেই কিছু না কিছু লেখাপড়া করেছিলেন, তবে হাইস্কুল-কলেজ হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডিও অতিক্রম করেছিলেন আব্বা একাই। প্রাতিষ্ঠানিক বিচারে এই পরিবারে প্রথম উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত।

লেখাপড়ায় ভালো ছিলেন, খঞ্জনপুর হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে বগুড়া শহরে গেলেন পড়তে। ঠনঠনিয়ার একটি বাড়িতে টিউশনির বিনিময়ে জায়গীর থেকে আযিযুল হক কলেজে পড়াশোনা করলেন। তাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদরদের অকৃত্রিম ও উদার সহায়তা পেয়েছিলেন। অল্প বয়সেই মাকে হারিয়েছিলেন। ভাই-ভাবীদের আদর-প্রশ্রয়ে বড়ো হয়েছেন। সত্যি কথা বলতে কি, ভাইয়ে ভাইয়ে এমন টান ও মমত্ববোধ আমার জীবনে খুব বেশি দেখিনি। এই ভ্রাতৃত্ববোধটি আমাদের গ্রামের বাড়িতে পরবর্তী প্রজন্মেও সম্প্রসারিত হয়েছিলো এবং এখনো তা ক্রিয়াশীল।

আব্বা একবার অল্প কিছুকালের জন্যে খঞ্জনপুর স্কুলে শিক্ষকতা করেছিলেন, সেই সুবাদে তিনি গ্রামে সবার কাছে পরিচিত হলেন মাস্টের হিসেবে। এমনকি, তাঁর ভাবীরাও আজীবন ওই ডাকই ডাকতেন।

আমার জ্ঞান হওয়ার বয়স থেকে দাদাকে দেখেছি সংসারের সাতে-পাঁচে তিনি আর নেই, সহায়-সম্পত্তি ও সাংসারিক দায়দায়িত্ব সব ছেলেদের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছেন দায়শূন্য জীবনযাপন করেন। দাদার মৃত্যুকালে আমার বয়স বাইশ, তাঁকে জাগরণের প্রায় সর্বক্ষণ দেখেছি কিছু না কিছু পড়তে। গ্রামের বাড়িতেই বেশিরভাগ সময় থাকতেন, মাসে-দু'মাসে লাঠি হাতে ঠুক ঠুক করে চার মাইল পথ হেঁটে জয়পুরহাট স্টেশন থেকে ট্রেন ধরতেন। থাকতেন এক নাগাড়ে বড়োজোর দুই কি তিন সপ্তাহ, তারপর গ্রামে নিজের ভিটা তাঁকে টানতো।

একটা কথা ঠিক, নাতি-নাতনিরা কেউই সে অর্থে তাঁর ঘনিষ্ঠতা পায়নি। দাদার সঙ্গে নাতি-নাতনিদের স্বাভাবিক ইয়ার্কি-ঠাট্টাও হতো না। আসলে তাঁর ব্যক্তিত্বটিই ওইরকম ছিলো। এমনিতে খুব নরম মনের মানুষ ছিলেন, একটুতেই আবেগাক্রান্ত হতেন। তবু খুব সম্পৃক্ত না হয়ে

সবার সঙ্গে কিছু দূরত্ব রাখার এই নাগরিক মানসিকতাটি ঠিক কীভাবে রপ্ত করেছিলেন জানি না।

দাদার পাঠের ধরণটি ছিলো বিচিত্র। খবরের কাগজের প্রথম পাতার ইয়ার প্যানেল থেকে শুরু করে সাতের পাতায় টেন্ডার নোটিশসহ শেষের পাতায় অমুক প্রেস থেকে মুদ্রিত পর্যন্ত টানা পড়তেন। কাগজটি আজকের হতে পারে, দুই মাস আগের হলেও ক্ষতি নেই। কোনো পত্রপত্রিকায় তাঁর কিছুমাত্র অরুচি নেই, নির্বিচারে সব পড়েন, সিনেমা পত্রিকা হলেও চলে। একটুও বাড়িয়ে বলা নয়, হাতের কাছে কিছু না পেলে আমার পাটীগণিত বই খুলে পড়তে শুরু করতেন। বই পেলে খুলে ফেললেন, যে পাতা খুললো সেখান থেকেই পড়া শুরু হলো। বইয়ের ওই অংশটি হয়তো আগেও পাঁচবার পড়েছেন, তাতে কিছু এসে যায় না। চোখে ভালো দেখতেন না, চশমা নেওয়ার কথা কানেও তুলতেন না। পাঠ্য জিনিসটি একেবারে চোখের ওপরে ধরে পড়তেন। পাঠে এমন সর্বভুক রুচি ছিলো দাদার।

বিদ্যাশিক্ষা বিষয়ে একটা কথা দাদা প্রায়ই আপনমনে বলতেন। তার সারমর্মটি এরকম : পাঠশালায় ভর্তি করে দিলাম, বই-খাতা-পেন্সিল সব কিনে দিলাম। লেখাপড়াটা কিন্তু আমি করে দিতে পারবো না। সেটা তোর নিজেকেই করতে হবে।

তাঁর আরেকটি সহজ দর্শন আমার খুব মনে ধরেছিলো। রোদ-বৃষ্টি-শীত-গ্রীষ্মের তীব্রতায় কাউকে বিরক্ত হতে দেখলে বলতেন, নালিশ করে কী হবে? বদলাতে পারবি? তা তো পারবি না।

রবীন্দ্রনাথের *শাজাহান* কবিতার প্রথম কয়েক পঙক্তি দাদা খুব আবৃত্তি করতেন – *এ কথা জানিতে তুমি ভারতঈশ্বর শাজাহান / কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান...*।

মাঝেমধ্যে দাদা একা একা বাড়িময় হেঁটে বেড়ান, দরজা-জানালাগুলি টিপেটুপে দেখেন, এমনকি ঘরের দেওয়ালও বাদ পড়ে না। এই গৃহটি তাঁর পুত্রের অর্জন বলে ধরে নিয়ে হয়তো পরখ করতেন। এইসব সময়ে বহুকাল আগে বিগত স্ত্রীকে স্মরণ করে হু হু করে শিশুদের মতো কেঁদে উঠতেন। গামছায় চোখ মুছতে মুছতে বলতেন, এগল্যা দেখে যার সবচে খুশি হওয়ার কথা, তাঁই নাই রে, তাঁই তো নাই।

ধর্মকর্মে দাদা উদাসীনই ছিলেন বলা যায়। অন্তত নামাজ-রোজার মতো নিয়মিত ধর্মীয় আচারগুলির কিছুই পালন করতে আমি কোনোদিন দেখিনি। কোরান পাঠ করতেও দেখিনি,

পড়তে জানতেন কি না তা- ও কখনো জানা হয়নি। কোনো কোনোদিন সকালে সাতটার সময় আম্মাকে বলতেন ঢাকা রেডিও ধরতে, মা কোরান তেলাওয়াতটা শুনি। শুক্রবারের জুম্মা পড়তে অবশ্য দাদা মসজিদে যেতেন। একাই যেতেন, আব্বাকে তো নয়ই, আমাদেরও কোনোদিন সঙ্গে যেতে বলেননি। আর যেতেন ঈদের নামাজে। আমার বাল্যকালে যেসব ঈদে তিনি আমাদের সঙ্গে থাকতেন, মনে আছে দাদা, আব্বা এবং আমি এই তিনপুরুষের প্রতিনিধি একসঙ্গে ঈদের নামাজে যেতাম। দাদার মৃত্যুর পর এই প্রথাটি আর চালু থাকেনি, আব্বা নিজেও ধর্মের প্রথাপালনে বিশ্বাসী ছিলেন না। যদিও ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন নিজের মতো করে, কোরানের অনেক আয়াত অর্থসহ আবৃত্তি করতে পারতেন। এককালে নামাজও পড়তেন শুনেছি, দেখিনি কখনো।

দোগাছি গ্রামে একজন খুব বিখ্যাত পীর ছিলেন। অনেক দূর- দূরান্ত থেকে ভক্ত ও মুরিদরা আসতো তাঁর দরবারে। তাঁকেও যেতে হতো মুরিদদের বাড়ি বাড়ি। এই পীরের তদারকিতে গ্রামে একটি মাদ্রাসাও পরিচালিত হতো। গ্রামেও তাঁর অনেক ভক্ত, কেউ কেউ ততোটা নয়, অনেকে প্রকাশ্যে কিছু না বললেও পীরকে সন্দেহের চোখে দেখে। আমার জ্যাঠারা ছিলেন সম্পূর্ণ ভিন্ন আরেক দলে, তাঁরা প্রকাশ্যেই পীরকে নাকচ করে দিতেন। মেজো জ্যাঠার মাধ্যমে কোনোভাবে পীর কেমন যেন আত্মীয়ও ছিলেন আমাদের, কিন্তু তাতে কিছু এসে যায়নি। আমার অল্পশিক্ষিত জ্যাঠারা পীর- ফকিরে বিশ্বাসী ছিলেন না। বাল্যকালে এমনকি যৌবনকালেও এই পীরের কোনো প্রভাব বা ধর্মীয় বিষয়ে উগ্রতা আমাদের পরিবারে দেখিনি। যদিও পরবর্তীকালে আমাদের পরবর্তী প্রজন্মের দুই- একজন ধর্ম বিষয়ে উগ্রমতের সমর্থক ও অনুসারী হয়ে ওঠে। যেন তা পুরো বাংলাদেশেরই একটি প্রতিনিধিত্বশীল ছবি।

ধর্মপালনে আমরা ভাইবোনরা কেউই উৎসাহী যে হইনি, তার পেছনের ইতিহাস হয়তো এই যে বাড়িতে মৌলবী রেখে কোরান পাঠ শেখানোর চেষ্টা কোনোকালে হয়নি, আরবি পড়া শিখতেই হবে এই বাধ্যবাধকতাও ছিলো না। আম্মা অবশ্য ধর্মীয় প্রথাগুলি বরাবর পালন করেন, আমাদের মাঝেমধ্যে মৃদু তাগাদা দিতেন। হয়তো স্রেফ নিয়মপালনের জন্যে, বলতে হয় তাই বলা। চাপিয়ে দেওয়ার ব্যাপার ছিলো না। অনেকের ছোটোবেলার রোমহর্ষক ভয়াবহ সব গল্প শুনেছি, নামাজ না পড়লে, কোরান পড়তে না শিখলে নির্মম প্রহারসহ অনেক প্রকারের শাস্তির বিধান। আমি নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করি যে ধর্মবিষয়ে এরকম একটি স্বাস্থ্যকর উদার পরিবেশ পেয়েছিলাম। এইসব নিয়ে গোঁড়ামি বা জবরদস্তি ছিলো না বলে।

আব্বার বড়ো ভাই এবং তাঁদের স্ত্রীরা আমাদের বড়ো- আব্বা বড়ো- আম্মা। ঠিক কোনজন নির্দিষ্ট করে বলতে গেলে বিপদ, তখন বলতে হয় বড়ো বড়ো- আব্বা বা ছোটো বড়ো- আম্মা। খুব

জুতের নয়, কিন্তু এই সম্বোধনই আমাদের ধরিয়ে দেওয়া হয়েছিলো। আমার জ্যাঠাদের পুত্রকন্যাদের কাছে আমার পিতা ছিলেন ছুটুবাবা। ফুপুদের ছেলেমেয়েদের কাছে অবশ্য তাঁরা সবাই মামা-মামী।

এই ছুটুবাবা তাঁর ভাইদের ছেলেমেয়দের আপন সন্তানবৎ দেখতেন – আদর-প্রশ্রয়-শাসনসহ। ছোটোবেলা থেকে দেখেছি আমার জ্যাঠাতো ভাইদের কেউ না কেউ আমাদের সঙ্গে। তখন জয়পুরহাট কলেজ চালু হয়নি, ফলে কলেজে লেখাপড়ার জন্যে বগুড়াই নিকটবর্তী সুবিধাজনক শহর। রাজশাহীর কথা আমার স্মরণে নেই, আম্মার কাছে শুনেছি সেখানে আমার ছোটো জ্যাঠার ছেলে খোকা ভাই নিতান্ত বালক বয়স থেকে আমাদের সঙ্গে ছিলেন। বগুড়ায়ও। আমরা তেঁতুলতলার বাড়িতে আসার কিছু পরে এলেন আশরাফ ভাই, বড়ো জ্যাঠার একমাত্র ছেলে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে যাওয়ার আগে পর্যন্ত ছিলেন আশরাফ ভাই। আমার এই জ্যঠাতো ভাইদের আদর্শস্থানীয় ছিলেন তাদের ছুটুবাবা। কালক্রমে ছুটুবাবার মতো তাঁরাও অধ্যাপনা পেশায় গিয়েছিলেন। খোকা ভাই জয়পুরহাট কলেজে বাংলার শিক্ষকতা করে কিছুকাল আগে অবসর নিয়েছেন। আশরাফ ভাই অর্থনীতি পড়েছেন, এখন মঙ্গলবাড়ি কলেজের অধ্যক্ষ।

জ্যাঠাতো ভাইদের মধ্যে আমার প্রিয় চরিত্র রেজ্জাক ভাই, খোকা ভাইয়ের সহোদর। নাম আবদুর রাজ্জাক হলেও স্থানীয় উচ্চারণে তিনি রেজ্জাক। লেখাপড়ার ধারকাছ দিয়েও যাননি, আমাদের এই বর্ধিত পরিবারে একটিমাত্র ব্যতিক্রম। না, ভুল হলো। আরেকজন ছিলেন এই দলে – মেজো জ্যাঠার ছেলে আফতাব ভাই। চাষবাস, হাল-বলদ, হৈ-হল্লা এইসব রেজ্জাক ভাইয়ের পছন্দের জিনিস। কখনো-সখনো বগুড়ায় এলে যেন খুব অনিচ্ছায় দু'একদিন থাকতেন। ফিরে নিজের যেতে পারলেই স্বস্তি। আমার বাল্যকালে আমরা দাদাবাড়িতে গেলে জয়পুরহাট স্টেশন থেকে একমাত্র বাহন গরুর গাড়ি। রিকশা বা বাস চলাচলের উপযুক্ত রাস্তা ছিলো না। রেজ্জাক ভাই গরুর গাড়ি নিয়ে আসতেন স্টেশনে। তাঁর দাবড়ানিতে গরুর গাড়ি যেন উড়ে যেতো। আফতাব ভাইও কখনো কখনো গাড়ি নিয়ে আসতেন। ধীর স্বভাবের আফতাব ভাইয়ের কাছে গরুগুলি কিছু স্বস্তি পেতো।

খুব তেজী ও আকর্ষণীয় ধরনের যুবক রেজ্জাক ভাই, সারাক্ষণ মুখে পান আর হৈ-হুল্লোড় নিয়ে আছেন। জয়পুরহাটে চিনিকল স্থাপিত হলে সেখানে শ্রমিক হিসেবে চাকরি নেন। সাইকেল চালিয়ে কাজে যেতেন রাতের শিফটে, ফিরে আসতেন সকালবেলা। বিয়ে করে ফুটফুটে দুটি মেয়ের বাবা হলেন। এরা অতি অল্প বয়সে এবং অল্প সময়ের ব্যবধানে সম্পূর্ণ অনাথ হয়ে যায়। এক অজ্ঞাত রোগে পূর্ণযুবক রেজ্জাক ভাইয়ের আকস্মিক মৃত্যুর কিছু পরে ভাবীও মারা যান। পিতৃমাতৃহীন শিশু দুটিকে বাড়ির তিন শরিকের সবাই চোখের মণি করে মানুষ

করেছিলেন। বিয়ে-টিয়ে হয়ে নিজেদের সংসার হয়েছে তাদের, এখনো চাচা-জ্যাঠাদের সংসারে তারা বাপের বাড়ির অধিকার নিয়ে আসে।

জ্যাঠাতো ভাইদের মধ্যে চারজন আমার চেয়ে বয়সে বড়ো – খোকা ভাই, রেজ্জাক ভাই, আশরাফ ভাই ও আফতাব ভাই। এক রেজ্জাক ভাই-ই আমাকে তুই করে বলতেন। বয়সের ব্যবধান সত্ত্বেও তাঁরা সবাই নিজেদের মধ্যে তুই-তোকারি করেন, অথচ রেজ্জাক ভাই ছাড়া অন্য তিনজন আমাকে তুমি সম্বোধন করেন। রেজ্জাক ভাইয়ের মুখে অসংকোচ তুই শুনতে খুব ভালোবাসতাম। তাঁর অকালমৃত্যুর পর সেই স্বস্তিটুকু অন্তর্হিত হলো।

দোগাছিতে গেলে প্রচুর কুশার খাওয়া হয়। চাষের মৌসুমে চিনিকলের কর্তারা বায়নাপত্র দিয়ে যায়, কাকে কী পরিমাণ আখ সরবরাহ করতে হবে। নির্ধারিত দিনে নিজেদের গরুর গাড়িতে তুলে চিনিকলের গেটে অপেক্ষা করো, দিনমান পরে জিনিস নামিয়ে টাকা নাও। তবে এই সরবরাহের কারণে খাওয়ার কুশারে টান পড়তো না। রেজ্জাক ভাই বা আফতাব ভাইয়ের সঙ্গে গিয়ে ক্ষেত থেকে কুশার কেটে আনা হতো। খেতে গিয়ে দাঁতের শক্তিপরীক্ষা হয়ে যেতো। কুশারের ছিলায় জিভ, ঠোঁটের কোণ কেটেকুটে যায়, কুশারের রসে জামাকাপড় চিটচিটে আঠালো। তবু না খেয় উপায় আছে? যে কুশারের ছিলা যতো পুরু ও শক্ত, তার মিষ্টতা ঠিক ততোটাই বেশি।

অর্থবিত্তের বিচারে দাদা ছিলেন নিতান্ত মধ্যবিত্ত, খুব সম্পন্ন গৃহস্থও বলা চলে না। বয়সকালে তাঁর বাস্তুভিটা ও জমিজমা ছেলেদের মধ্যে ভাগাভাগি হলে বিত্তের ক্ষমতাটিও ভাগ হয়ে গিয়েছিলো। বাংলাদেশের কৃষিনির্ভর প্রতিটি পরিবারের গল্প যেমন হয়। আমার জ্যাঠারাও খুব বাস্তববাদী সংসারী বা উদ্যোগী পুরুষ ছিলেন এমন বলা যায় না। যা আছে তাই দিয়ে কোনোমতে চলে যায়, যাবে – এইরকম মনোভাবই ক্রিয়াশীল থাকে। চাষবাসের বাইরে কিছু করার চিন্তা তাঁরা কোনোকালে করেননি, উদ্যোগ আরো পরের কথা। ফলে অভাবগ্রস্ত তাঁরা কোনোকালে হননি, তবে খুব সচ্ছল অবস্থাও ছিলো না। ভবিষ্যতের বিনিয়োগ বলতে একটি জিনিস তাঁরা করেছিলেন, ছেলেদের লেখাপড়ায় উৎসাহিত করেছেন এবং সহায়তা দিয়েছেন। রেজ্জাক ভাই বা আফতাব ভাইয়ের মতো দুয়েকজন অবশ্য সেদিকে যায়নি। মেয়েদের জন্যে ছিলো প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা।

আব্বা যেহেতু শহরবাসী, সেখানে তাঁর একটি কর্ম ও অর্থাগমের সংস্থান আছে এবং সর্বোপরি তাঁর বিদ্যাশিক্ষার কালে ভাইরা তাঁকে যে সহায়তা ও সমর্থন দিয়েছিলেন তা বিস্মৃত না হয়ে গ্রামে নিজের ভাগের জমিজমার সবটাই জ্যাঠাদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে দেন। উল্লেখ না

করলে অন্যায় হবে যে এই বিষয়টিও ঠিক একতরফা ছিলো না। গ্রামের বাড়ি থেকে বগুড়া এলে খালি হাতে কেউ আসতেন না, দরকারে বিশেষ কোনোকিছুর জন্যে ফরমায়েশও পেশ করা যেতো এবং তা অপূর্ণ থাকতো না। এইসব লেনদেনে কোনো মোটাদাগের হিসেব-নিকেশ নেই। শুধু আজকের বিচারে নয়, সেইসব দিনেও এই সৌহার্দ্য খুব সুলভ ছিলো না।

পৃথিবীর সব ছেলেমেয়ের মতো মায়ের রান্নার জন্যে দুর্বলতা আমারও। কিন্তু রাঁধুনি হিসেবে আম্মার চেয়ে ওপরে রাখি আমার বড়ো জেঠীকে। তিনি ছিলেন স্বভাব-রাঁধুনি। খুব যত্ন নিয়ে করতেন বলে মনে হতো না। পুরো প্রস্তুতি নিয়েও শুরু করতেন না মনে হয়, রান্না শুরু করে হয়তো দেখলেন কাঁচামরিচ বা বেগুন ঘরে নেই, অথবা হয়তো মনে হলো দুটো টমেটো দিলে ভালো হয়। রান্না বন্ধ না করেই বাড়ির পেছনে ক্ষেত থেকে দরকারি জিনিসটি এনে কেটেকুটে হাঁড়িতে ফেলে দিলেন। এর বাইরে কোনো রহস্য নেই, কেরামতিও কিছু নেই। অথচ সেই রান্নার যে অপূর্ব স্বাদগন্ধ তার বর্ণনা হয় না। হোক তা নেহাত নিরামিষ বা ছোটো মাছের ঝোল।

আব্বার ভাইরা সবাই মাংসের ভক্ত। আমরা গ্রামের বাড়িতে গেলে সেই উপলক্ষেই হয়তো একটা খাসি জবাই করে ফেলা হলো। তারপর উঠানের চুলায় চার ভাই মিলে রান্না করতে লেগে গেলেন প্রচুর শুকনো মরিচ দেওয়া ঝাল-মাংস। ঝাল খাওয়ার একটি রীতি ওই বাড়িতে তৈরি হয় দাদাকে দিয়ে, ওরকম অবিশ্বাস্য রকমের ঝাল খেতে এ জীবনে আর কাউকে দেখিনি। খেতে বসে প্রচণ্ড ঝালে মুখ ঘেমে উঠছে, পাশে রাখা গামছায় মুখ-কপাল মুছে আবার খাওয়ায় মন দিলেন – এই দৃশ্য ছিলো প্রতিদিনের। তাঁর পুত্ররাও সেই ঐতিহ্যের অনেকটাই রক্ষা করেছিলেন। চার ভাইয়ের সম্মিলিত রান্নার সময় তাঁদের ছেলেমেয়েরা, বউ-ঝিরা দাওয়ায় বা উঠানে বসে দেখছে, সঙ্গে চলছে রঙ্গ-রসিকতা আর হাসি-তামাশা যার যোগানদারও মূলত ওই চার ভাই।

রঙ্গ-রসিকতায় এই পরিবারের খ্যাতি আছে। একটি ছোটো ঘটনা বলা যাক। মেজো ঝ্যাঠার এক পুত্র জালাল তখন এগারো-বারো বছরের বালক। একদিন এক প্রতিবেশী জিজ্ঞেস করলেন, কী দিয়ে ভাত খেলি আজ? জালারের সংক্ষিপ্ত উত্তর, হাত দিয়ে।

দোগাছি গ্রামে ঢোকার মুখে বিশাল বটবৃক্ষের তলায় কিছু চাতাল তোলা। জায়গাটিকে বলা হয় দরগাতলা। সপ্তাহে দু'দিন বিকেলে হাট বসে। খুবই ছোটো হাট। সন্ধ্যার কিছু পরে উঠে যায়। দরগাবাড়ি হাট। হাটের সময় ছাড়া এখানে গ্রামের কেউ না কেউ সারাক্ষণ থাকে। আশপাশের ক্ষেতে কাজ করতে করতে লোকজন খানিক বসে জিরিয়ে নেয়, তামাক খেতে খেতে খোশগল্প করে। হাসি-তামাশা হয়। এই অঞ্চল সাধারণভাবে বন্যা-দুর্যোগের আওতার বাইরে বলে

এইসব নিয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় সময় অতিবাহিত হয় না। তবে মনুষ্যজন্মজনিত রোগশোক তো থাকেই, তা-ও কথাবর্তায় চলে আসে।

ঘরে কোনো দরকারে আমার জ্যাঠাদের খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, যাও দরগাতলা। সেখানে গেলে দেখা যাবে তিন ভাই-ই হয়তো সেখানে উপস্থিত, বন্ধু-প্রতিবেশী বা যে কারো সঙ্গে গল্পগুজবে মশগুল। কমবয়সী কেউ হলেও ক্ষতি নেই, দরগাতলার আড্ডা বলে কথা। পাশের সরু সড়ক দিয়ে গ্রামের কেউ কাছের শহর জয়পুরহাটে যাচ্ছে বা আত্মীয়বাড়ি থেকে ফিরে আসছে, তা সে পায়ে হেঁটে হোক কি সাইকেলে, দরগাতলায় একবার বসে না গেলে চলে!

পারিবারিক গণ্ডির বাইরে দোগাছি গ্রামের হোসেন ভাই আমার বাল্যকালে দেখা খুব উল্লেখযোগ্য এক চরিত্র। আব্বার সমবয়সী তিনি, গ্রাম-সম্পর্কে মামা-ভাগ্নে তাঁরা যদিও সে ধরনের কোনো সম্বোধন তাঁরা পরস্পরকে কখনো করেছেন বলে শুনিনি। বন্ধুস্থানীয় হলেও পরস্পরকে তাঁরা আপনি সম্বোধন করতেন। আমার বাল্যকালে যখন তাঁকে চিনলাম তখন গ্রামে বাস করেন না হোসেন ভাই, থাকতেন যশোরে, ওয়াপদার চাকরি। ওয়াপদা তখন পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ, অনেক পরে যা বিদ্যুৎ ও পানি বিষয়ক পৃথক দুটি বিভাগে বিভক্ত হয়। ওয়াপদার চাকরি মনে হয় তখন বেশ লোভনীয়ই ছিলো। বলা হতো, মাছের মধ্যে পাবদা, চাকরির মধ্যে ওয়াপদা।

পান-খাওয়া হোসেন ভাইয়ের মুখে সবসময় একটি স্মিতহাসি লেগে থাকে। শান্ত ও ধীরগলায় কথা বলেন, আবেগ-উচ্ছ্বাস খুব একটা প্রকাশ পায় না। তবে কোনো এক অজানা উপায়ে তাঁর স্বভাবের উষ্ণতাটি ঠিক ঠিক টের পাওয়া যায়। যশোর থেকে পোস্টকার্ডে চিঠি লিখতেন, ছুটিছাটায় দোগাছি গেলে বগুড়ায়ও আসতেন। হাতে আমাদের জন্যে ক্রীম বিস্কুট বা চকোলেট-টফির প্যাকেট।

বিয়ে করেছিলেন একটু দেরিতে, নতুন ভাবীকে নিয়ে গ্রামে এসেছেন তখন আমরাও দোগাছিতে। বৌভাত ধরনের অনুষ্ঠানের কথা অস্পষ্ট মনে আছে। পরদিন সকালে খোকা ভাই নতুন ভাবীর সঙ্গে পরিচিত হতে যাবেন, আমাকেও সঙ্গী করলেন। ভাবীর পরিচ্ছন্ন ঢলঢল মুখটি হাসিখুশি, তখনো বিয়ের গয়না পরা চেহারা স্পষ্ট মনে আছে। ভাবী কথাবার্তায় সাবলীল ও পটু। খোকা ভাইয়ের সঙ্গে কিছু হালকা রসিকতাও করলেন।

যথাসময়ে একটি পুত্রসন্তান হলো তাঁদের, নাম রাখা হলো রুবন। হোসেন ভাই একসময় বদলি হয়ে বগুড়া এলেন। শহরের একেবারে উত্তরে ওয়াপদা কলোনিতে থাকেন তখন। একসময় অনিয়মিত হলেও যাওয়া-আসা অটুট।

বয়স বাড়তে থাকলে কালক্রমে বাল্যকালের অনেক প্রিয় মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ ক্ষীণ হয়ে আসে। হোসেন ভাই এবং আমার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছিলো। বস্তুত আমি দেশান্তরী হওয়ার পর দীর্ঘকাল কোনো খোঁজখবরও জানতাম না। যখন জানলাম এবং যা জানলাম তার জন্যে আমি প্রস্তুত ছিলাম না। বিবরণটি এরকম: একসময় হোসেন ভাইয়ের সঙ্গে ভাবীর সম্পর্ক চূড়ান্ত রকমের খারাপ অবস্থায় চলে যায়। সম্পত্তিঘটিত কোনো বিষয় তার মূলে। অবস্থা ক্রমে শত্রুতার পর্যায়ে চলে যায় এবং তাতে ভাবী পুত্রের সমর্থন পান। এইসময় এক রাতে স্ত্রী-পুত্রের হাতে হোসেন ভাই খুন হন। আদালতে মামলা উঠলে মা-ছেলের যাবজ্জীবন সাজা হয়। আমার আজও বিশ্বাস হয় না, হোসেন ভাইয়ের মতো মানুষের সঙ্গে কারো ওই পর্যায়ের শত্রুতা হওয়া সম্ভব। আর বাল্যকালে দেখা নতুন ভাবীর যে চেহারাটি আমার স্মৃতিতে আছে, এই ঘটনা তার সঙ্গে মেলানো সম্ভব হয় না। জীবন কতো বিচিত্র ও অচেনা পথে নিয়ে যায় আমাদের। কতো যে অপ্রত্যাশিত বাঁক এই পার্থিব জীবনের!

ট্রেনে- বাসে বা রিকশায়, এমনকি গরুর গাড়িতেও
শব্দ ও গতি দুই- ই অনুভবগ্রাহ্য।
কিন্তু বিমানযাত্রার মতো দীর্ঘ নৌকাযাত্রাও বিরক্তিকর ও একঘেয়ে লাগে,
চলছি বা কোথাও যে যাচ্ছি সেই অনুভবটিই থাকে না।
অতি বড়ো প্রকৃতিপ্রমিকেরও খোলা আকাশ, নদীর পানি ও আশপাশের গ্রাম,
তার বৃক্ষপল্লব দেখতে দেখতে একসময় ক্লান্ত না হয়ে উপায় থাকে না।

শিকড়ের গল্প : কালিকাপুর

কালিকাপুর নামের গ্রামটিতে ক্ষীয়মাণ ও ক্ষীণপ্রাণ নলামারা নদীর ওপারে কুয়াশায় কুয়াশা। নদীর পানির ওপরে ঘন কুয়াশা ভাসে, শীতসকালের অল্প হাওয়ায় ধোঁয়ার মতো পাক খায়। ঘাটে বসে একজন বয়স্ক মানুষ নিমের দাঁতনে দাঁত মাজেন। মানুষটির পরনে লুঙ্গি, পা দু'টি খালি, গায়ে ফতুয়ার ওপর জড়ানো আলোয়ান। দাঁতমাজা শেষ হলে ঝুঁকে পড়ে নদীর শীতল পানিতে হাত ডুবিয়ে দেন। আমার মাতামহ। তিনি আর নেই, অনেকগুলি বছর চলে গেলো। নলামারা নদী হেজেমজে নিশ্চিহ্ন হতে হতেও টিকে আছে কোনোমতে। তাঁকে এখনো দেখি পৌষের ভোরে কুয়াশার ভেতরে বসে নলামারার ঘাটে দাঁত মাজেন, অজু করেন। এরপর তিনি নিজের ঘরে জায়নামাজ বিছিয়ে একা একা ফজরের নামাজ পড়বেন। লেখাপড়া জানেন না, নিজের নামটি স্বাক্ষর করার মতো অক্ষরজ্ঞানও তাঁর নেই, কিন্তু ধর্মাচরণকে ব্যক্তিগত করে রাখার শিক্ষা তাঁর নিজের অভিজ্ঞান ও অর্জন। বয়োজ্যেষ্ঠতার অধিকারে পুত্র- কন্যা, আত্মীয়-পরিজন কাউকেই এই বিষয়ে কোনো আদেশ দেন না, উপদেশ বর্ষণ করেন না। তিনি যথার্থ বিজ্ঞ এক আধুনিক মানুষ ছিলেন।

বাল্যকালে আমাদের বৃহত্তম উৎসবের নাম ছিলো নানাবাড়ি যাওয়া। তবে যাওয়া- আসার ব্যাপারটি অতো সহজ ছিলো না। অজ পাড়া- গাঁ বলতে যা বোঝায়, কালিকাপুর আসলে তার যথার্থ প্রতিনিধি। পাশাপাশি আধ মাইলখানেকের ব্যবধানে দুই কালিকাপুর – বড়ো কালিকাপুর ও ছোটো কালিকাপুর। লোকমুখে বড়ো ক্যালক্যাপুর ও ছুটু ক্যালক্যাপুর। আমার নানাবাড়ি বড়ো কালিকাপুর থেকে থানা রানীনগর হাঁটাপথে ছয়- সাত মাইল। সবচেয়ে কাছের শহর বলতে নওগাঁ, বারো মাইল দূরে। লটবহর নিয়ে পায়ে এতোটা পথ যাওয়ার প্রশ্ন নেই, নৌকা তখন কালিকাপুর যাওয়ার একমাত্র বাহন। ভরা বর্ষায় ক্ষুদ্র নলামারাও ফুলেফেঁপে লঞ্চ চলাচলের উপযুক্ত হয়, নওগাঁ থেকে লঞ্চে উঠে কালিকাপুর গ্রামে ধাওয়াপাড়ার সম্মুখবর্তী ঘাটে নেমে

পড়লেই চলে। সেখান থেকে শ'পাঁচেক গজ দূরে নানাবাড়ির ঘাটে যেতেও নৌকা ছাড়া গতি নেই।

বর্ষাকাল ছাড়া অন্যসময়ে ট্রেনে শান্তাহারে নেমে রিকশা বা টমটমে তিন মাইল দূরে নওগাঁয় তাজ সিনেমা সংলগ্ন ব্রীজের ওপারে যমুনা নদীর (মূল যমুনার ক্ষুদ্র একটি শাখা, এর নামও যমুনা) ঘাটে অপেক্ষমাণ নৌকায় আরোহন। নৌকায় বারো মাইল পথ, সে এক অনন্তযাত্রার সমান।

বিকল্প বলতে শান্তাহারে ট্রেন বদল করে রঘুরামপুর বা আত্রাই স্টেশন। নৌকাযাত্রার পথ কিছুটা কমে তাতে, কিন্তু সংযোগকারী ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা এবং লটবহর নিয়ে ওঠানামার ঝামেলা কিছুমাত্র কম নয়। আত্রাই নদীর ওপরে আত্রাই রেলস্টেশন (পরবর্তীকালে স্থানীয় প্রভাবশালী আহসানউল্লাহ মোল্লার নামে স্টেশনটির নাম হয় আহসানগঞ্জ) থেকে কালিকাপুর আট মাইল। রঘুরামপুর (পরে নামকরণ হয় সাহাগোলা) আমাদের জন্যে ব্যবহারযোগ্য শুধুমাত্র বর্ষাকালে। এখানে কাছাকাছি কোনো নদী নেই। বর্ষায় নিকটবর্তী যমুনা ও আত্রাইয়ের মিলিত পানিতে প্লাবিত মাঠ বিল হয়ে যায়। এখান থেকে নানাবাড়ি তখন মাত্র চার মাইল। কিন্তু ছোটো স্টেশন রঘুরামপুরে মেলট্রেন থামে না, লোকালের জন্যে শান্তাহারে বসে থাকতে হয়।

যে স্টেশনেই নামা হোক, নৌকা থাকতো ঘাটে। মাঝিমাল্লাদের সঙ্গে নানা নিজে আসতেন। আমরা যখন খুব ছোটো সেই সময় নানার ছিলো পানসি নৌকা। ছইঘেরা দীর্ঘ ছিপছিপে শরীরের পানসির সৌন্দর্য রাজকীয় ও রমণীয়। ঠিক কারণ জানি না, আমরা বড়ো হয়ে উঠতে উঠতে পানসির চল কমে আসতে থাকে। নানার নৌকাও পাল্টে গেলো, এগুলির দৈর্ঘ্য পানসির প্রায় অর্ধেক হলেও বেশ চওড়া। নৌকায় আব্বা ও নানা বসেন খোলা জায়গাটায় মাস্তুলের কাছে। খুব বেশি রোদ হলে ছাতা খুলে বসা। গুণ টানার দরকার হলে নানা বৈঠা হাতে হাল ধরেন। ছইয়ে ঢাকা অংশে আম্মার সঙ্গে আমরা ছোটোরা। সেখানে পাটাতনের ওপর পুরু পাটি বিছিয়ে চাদর-বালিশ রাখা। একপাশে ঢাকা দেওয়া বাসনকোসনে ভাত-তরকারি, নানী ভোররাতে উঠে নিজের হাতে রান্না করে দিয়ে দিয়েছেন। মোটা বোরো চালের ভাত, মাছের তরকারি এবং অবধারিতভাবে মুরগির মাংস। মাংস ছাড়া জামাইয়ের আপ্যায়ন হয় না, হোক তা নৌকায় এবং ঠাণ্ডা হয়ে যাওয়া। নদীর হাওয়া বা অন্য কোনো কারণে জানি না, কাঁসার থালায় ওই ঠাণ্ডা ভাত-তরকারিতেই অমৃতের স্বাদ।

স্বল্প ও মৃদুভাষী নানা আমাদের ছোটোদের সঙ্গে গল্প করেন, কিছু ঠাট্টা-রসিকতা হয়। একসময় আব্বা-আম্মার সঙ্গে তাঁর শুরু হয় বড়োদের কথাবার্তা – গেরস্থালি, ফসল, শরিকদের

সঙ্গে সম্পর্কের ভালোমন্দ এইসব। তার কিছু আমরা বুঝি, কিছু না-বোঝা। আমরা তখন নিজেদের মধ্যে ঢুকে যাই।

জেলেদের দল মাছ ধরছে দেখলে নানা গলা উঁচু করে জিজ্ঞেস করেন, কী মাছ? পছন্দ হলে হয়তো কিনে ফেলা হলো একটা বড়ো রুই, চিতল বা পাঙাস।

ট্রেনে-বাসে বা রিকশায়, এমনকি গরুর গাড়িতেও শব্দ ও গতি দুই-ই অনুভবগ্রাহ্য। কিন্তু বিমানযাত্রার মতো দীর্ঘ নৌকাযাত্রাও বিরক্তিকর ও একঘেয়ে লাগে, চলছি বা কোথাও যে যাচ্ছি সেই অনুভবটিই থাকে না। অতি বড়ো প্রকৃতিপ্রমিকেরও খোলা আকাশ, নদীর পানি ও আশপাশের গ্রাম, তার বৃক্ষপল্লব দেখতে দেখতে একসময় ক্লান্ত না হয়ে উপায় থাকে না। একেকটা ঘাটে নদী-দাপানো বালকের দলগুলিও একটি থেকে আরেকটি আলাদা করা যায় না তখন। প্রতিদিন দেখা হয় না বলে শিকারের দিকে একাগ্র হয়ে ডানা ঝাপটানো মাছরাঙা, হুশ করে শুশুকের চকিত ডিগবাজি, নদীর পানিতে ঝুঁকে পড়া বাঁশঝাড়, কোথাও একটি বিশাল শিমুল বা ঝুরি-নামানো বটবৃক্ষ আমাদের শহুরে চোখকে কিছু তৃপ্ত করে বটে, তবু অবিলম্বে অবসন্ন শরীরে চোখের পাতা ভারী হয়ে আসে। ঘুমে তলিয়ে যাই।

নলামারার নাগাল পাওয়া গেলে আম্মা তখন আমাদের ডেকে তোলেন। বোঝা যায়, প্রায় এসে গেছি। নলামারা ঠিক নদী নয়। যমুনা ও আত্রাইয়ের মধ্যে মাইল চারেক দীর্ঘ একটি সংযোগ খালবিশেষ। এর ঠিক মাঝামাঝি জায়গায় নানাবাড়ির ঘাটে আমাদের নৌকা ভেড়ে।

(প্রকাশকের কথা :
এই অধ্যায়ের পরে মুহম্মদ জুবায়ের বেশ কিছু নোট নিয়ে রেখেছিলেন , যেগুলো আর উনি বিস্তারিত লিখেননি ।
নোটগুলো অবিকৃত রেখে দেয়া হলো ।)

মাসের এক তারিখ
বছরের চাল কেনা। মশলাপাতি, ডাল জাতীয় জিনিস মাসের শুরুতে বড়ো বাজার থেকে কেনা হতো, এই মাসের বাজারের সময় আমি আব্বার সঙ্গী হতাম মনে আছে।
ফুটবলে একজোড়া বুটের স্বপ্ন এবং অর্ণবের বুট

আব্বার সফরসঙ্গী – যশোর-খুলনা-বাগেরহাট-দৌলতপুর-খালিশপুর, ফুপুদের বাড়ি,
মজিবর মামা / মোখলেস চাচা
চট্টগ্রাম ভ্রমণ – মোখলেস চাচা ফরেস্ট অফিসার শুনে মনে হয়, ফরেস্ট অফিসার শহরে কেন?
কলেজের অ্যানুয়াল স্পোর্টস
হরলিকস ও ওভালটিন

৭০-এর শিক্ষাসফর। কমলাপুর স্টেশনে চটিবই, বালকত্ব ভাঙার প্রান্তসীমায়।

মিষ্টি মুখে দিয়ে বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখি বেশ বড়ো একটা বাঁক নিচ্ছে ট্রেন।
আমি পেছনের সবগুলো বগি দেখতে পাচ্ছি।
রোদ পড়ে ট্রেনের ধাতব শরীর চকচক করে।
ট্রেনের গতির প্রতিক্রিয়ায় রেললাইনের পাশে ধুলোর ছোটো ছোটো ঘূর্ণি।

বালক বিস্ময়-বিহ্বল চোখে সেদিকে তাকিয়ে থাকে।
তখন সে জানে না, এই দৃশ্য তার সারাজীবনের সঙ্গী হয়ে থাকবে।
চোখ বুজলে এই ছবি অবিকল দেখবে সে বারংবার।

নিউ ইয়র্কের চলন্ত সাবওয়েতে বসে পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয়,
অনেক অনেক বছর পর, যখন বাবা আর কোথাও নেই,
এই ট্রেনযাত্রা কি তার মনে পড়বে?

অনেককালের পুরনো একটি দিন ফিরে এলো

গত বছর ছেলেমেয়েদের গ্রীষ্মের ছুটিতে নিউ ইয়র্ক গিয়েছিলাম। এর আগেরবার যাওয়া হয়েছিলো ২০০০-এ। তখন পুত্রের বয়স তিন হয়নি, ফলে সেই সফরের কিছুই তার মনে নেই। এবারের যাওয়া মূলত তারই আগ্রহ ও উৎসাহে।

একদিন দুই বাপ-ব্যাটা রওনা হয়েছি বিখ্যাত মিউজিয়াম অব ন্যাচারাল হিস্ট্রি দেখতে। ডাইনোসর বিষয়ে তার আগ্রহ সেই আধো আধো বোলের বয়স থেকে, ক্রমে বিবিধ প্রকারের ডাইনোসর সংক্রান্ত তথ্যের চলমান ভাণ্ডার হয়ে ওঠে সে। এই মিউজিয়ামে অনেক ডাইনোসর-কংকাল আছে সে জেনেছে। সুতরাং সেখানে যাওয়া তো আবশ্যক।

ছেলেকে নিয়ে সাবওয়েতে। নিউ ইয়র্কের রাস্তাঘাট চিনি না, সাবওয়ে সম্পর্কে ততোধিক অজ্ঞ। আমরা যে শহরে বাস করি, সেখানে সীমিত দূরত্বে কিছু ট্রেন চলাচল সবে শুরু হয়েছে। কোন ট্রেনে উঠতে হবে, কোথায় ট্রেন বদল করতে হবে, কোথায় যাত্রা শেষ করতে হবে এইসব তথ্য লেখা কাগজ পকেটে।

নিউ ইয়র্কের সাবওয়ে ভূগর্ভে, ফলে ট্রেন চলাকালে বাইরে তাকিয়ে অন্ধকার টানেল ছাড়া কিছু দেখার নেই। পুত্রের বিবিধ কৌতূহল, সে বিষয়ে প্রশ্নোত্তর পর্ব চলছে। এইসব আমাদের হয় নিত্যদিন। ভাবি, আমাদের বাবাদের আমরা এতো প্রশ্ন করতে পারতাম না। ওই বয়সে পিতা সম্পর্কে ভালোবাসার চেয়ে সমীহ বা ভয়ের অনুভূতিই বেশি ছিলো মনে আছে।

ছেলের সঙ্গে কথা বলতে বলতে আচমকা অনেককাল আগের একটি কথা মনে পড়ে যায়। আমি আমার পিতার সঙ্গে ট্রেনে করে যশোর যাচ্ছি। আমার বয়সও তখন দশ হয়েছে কি হয়নি। সেই যাওয়ার উপলক্ষ কী ছিলো, কেন শুধু আমরা দুই পিতাপুত্র যাচ্ছি সেসব কিছুই মনে পড়ে না। সেই ভ্রমণটি আমার স্পষ্ট স্মরণে আছে।

বগুড়া থেকে শান্তাহার জংশন। সেখানে ট্রেন বদলে ব্রডগেজ রেলে ওঠা। ব্রডগেজে এই আমার প্রথম নয়। দাদার বাড়ি জয়পুরহাট যেতে হলেও শান্তাহারে ট্রেন বদলে ব্রডগেজ ট্রেনে উঠতে হয়। তখন বগুড়ার সঙ্গে জয়পুরহাটের নামমাত্র সড়কপথ থাকলেও তা ছিলো অতিশয় দুর্গম এবং বাস সার্ভিস বলে কিছু ছিলো না।

শান্তাহার থেকে জয়পুরহাট মাত্র পাঁচটি স্টেশনের দূরত্ব। এবারে আমরা যাচ্ছি জয়পুরহাটের উল্টোদিকে এবং দূরত্বও অনেক অনেক বেশি।

ব্রডগেজে দীর্ঘযাত্রায় ট্রেনের দুলুনি খুব বেশি করে টের পাওয়া যায়। দুলুনিতে শুধু বালক কেন, বয়স্কদেরও ঘুম পেয়ে যায়। মাঝেমধ্যে ঘুম ভাঙিয়ে বাবা আমাকে দর্শনীয়গুলো দেখান। হার্ডিঞ্জ ব্রিজ, রাজশাহীর বিখ্যাত চলনবিলের বিশাল বিস্তার। নাটোরে বিখ্যাত কাঁচাগোল্লা খাওয়া হলো। আবার ঘুম ভাঙলো বাবার ডাকে। চৌকোনা এক ধরনের মিষ্টি কোনো স্টেশন থেকে কিনেছেন, আমাকে খাওয়াবেন। ঘুমচোখে বাইরে তাকাই। জানালার পাশে বসেছি বলে বাইরে মুখ বাড়ালে বাতাসের তীব্র ঝাপটা মুখে লাগে। হাত প্রসারিত করে দিলে বাতাসের তোড়ে হাতটা খুলে যাবে মনে হয়। মিষ্টি মুখে দিয়ে বাইরে মুখ বাড়িয়ে দেখি বেশ বড়ো একটা বাঁক নিচ্ছে ট্রেন। আমি পেছনের সবগুলো বগি দেখতে পাচ্ছি। রোদ পড়ে ট্রেনের ধাতব শরীর চকচক করে। ট্রেনের গতির প্রতিক্রিয়ায় রেললাইনের পাশে ধুলোর ছোটো ছোটো ঘূর্ণি। বালক বিস্ময়-বিহ্বল চোখে সেদিকে তাকিয়ে থাকে। তখন সে জানে না, এই দৃশ্য তার সারাজীবনের সঙ্গী হয়ে থাকবে। চোখ বুজলে এই ছবি অবিকল দেখবে সে বারংবার।

নিউ ইয়র্কের চলন্ত সাবওয়েতে বসে পুত্রের মুখের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, অনেক অনেক বছর পর, যখন বাবা আর কোথাও নেই, এই ট্রেনযাত্রা কি তার মনে পড়বে? যেমন আমার পড়লো?